



SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/149

Book should be returned by date (last) noted below
or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise
daily shall have to be paid.

1-3

SP

3/149

7/1

ব্রহ্মবাদিনী



স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী

৭৯ ১৩

3/149. 9/1

PRESENTED

Presented to Sri Ananda Mayee

Ashram with Lilavay

with the good wishes of the author.

Gowda Math, Banaras

7-9-52

LIBRARY

No. ... 3/149

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

BANARAS

ব্রহ্মবাদিনী

No. ৫৩

3/149

৩/১

স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী
প্রণীত।

সর্বস্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ২০

কাশী, গোবিন্দ মঠ

হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক

প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগুরু লাইব্রেরী—২০৪ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট

মহেশ লাইব্রেরী—২১১ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা, এবং গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

মুদ্রক—

পি. ঘোষ,

সরলা প্রেস, বেনারস।

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অবতরণিকা	১০
প্রথম	মদানসা ...	১
দ্বিতীয়	ককটী রাক্ষসী ...	৪৫
তৃতীয়	সুলভা ...	৬০
চতুর্থ	গান্ধী ...	৭৮
পঞ্চম	লীলা ...	১০৩
ষষ্ঠ	চুড়ানা ...	১৪৬

विष्णु

क

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

विष्णु

অবতরণিকা

সমাজ-জীবনে নারীর স্থান এবং সমাজের বিকাশ ও অগ্র-
গতিতে নারীর দান মহৎ। সভ্য দেশ মাত্রেই নারী প্রতিভা
নানা ক্ষেত্র আলোকিত করিয়াছে। মানব সভ্যতার উষায়
পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, সেই প্রাচীনতম যুগেও, ইহার অপ্রাচুর্য্য
ছিল না। আধুনিক সময়েও ভারতজননী অনেক কীর্তিমতী
কণ্ঠার প্রসূতি। রাজ্যশাসনে দক্ষতায়, জনহিতকর কার্যে
মুক্তহস্ততায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে উদারতায় অহল্যাবান্ধি, রাণী-
ভবানী প্রভৃতি সর্ববিদিত। যুদ্ধক্ষেত্রে, সমর কুশলতায় লক্ষ্মী
বান্ধি প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। দেশপ্রেমে আত্মবিসর্জন দিয়া,
পতিপ্রেমে সহায়তা হইয়া কত নারী জন্মভূমিকে তীর্থীভূত
করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। প্রাচীন যুগের
অলোকসামান্য সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী হইতে ঐতিহাসিক
যুগের পদ্মাবতী, দুর্গাবতী, সংযুক্তা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্বল।
রাজপুত রাজ্যবিপ্লবে রাণী পদ্মিনী সহ, ও সময়ান্তরেও, সহস্র
সহস্র নারী জাতীয় পবিত্রতা ও নিজের ধর্ম রক্ষার্থ জ্বলন্ত অনল-
কুণ্ডে জীবনাহুতি দিয়াছিলেন—রাষ্ট্রীয় তীর্থতুল্য চিতোর দুর্গ
আজও তাহার সংক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভগবৎপ্রেমে মগ্না
মীরাবান্ধি প্রভৃতি সর্বপূজ্য। বিদ্যাক্ষেত্রেও নারীরা অসামান্য
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রূপিল শিষ্য প্রসিদ্ধ সাংখ্যাচার্য্য

আশুরির দার্শনিক পত্নী কপিলাই ‘কপিলা স্মৃত’ নামে খ্যাত ষষ্ঠিতত্ত্ব-প্রণেতা পঞ্চশিখাচার্য্যের জ্ঞানগুরু। মগুন-পত্নী ভারতী শঙ্করাচার্য্যের সহিত শাস্ত্রার্থ করিয়াছিলেন। গণিত-বিজ্ঞান ও জ্যোতিষে লীলাবতী, খনা প্রভৃতি গমর হইয়া আছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে লক্ষ্মীদেবী, বিলাসদেবী, প্রাণমঞ্জরী, অবিলম্ব সরস্বতী, বিজ্জিকা, অবন্তী সুন্দরী প্রভৃতি বহু বিখ্যাত মহিলা কবি, নিবন্ধ রচয়িত্রী, টীকাকর্ত্রীর নাম পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে ইংরাজ শাসনের পূর্বে তথা বর্তমান সময়েও বহু মহিলা কবি ও লেখিকা ভারতী-মন্দির ভূষিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। তারপর সকলের শীর্ষস্থানীয় ‘গুরোগরিয়ান’ অতি প্রাচীন বেদে যে সকল বিশ্রুতকীর্ত্তি নারীর নাম পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে অনেকে ‘ব্রহ্মবাদিনী’ বলিয়া বর্ণিত। বর্তমান গ্রন্থে ব্রহ্মবাদিনীদের কথা বলাই উদ্দেশ্য। বিস্তারিত বর্ণনার উপযোগী উপকরণের অভাব বশতঃ বেদোক্ত ব্রহ্মবাদিনীদের যে যৎসামান্য পরিচয় পাওয়া যায় তাহা এইখানেই উল্লেখ করিতেছি। শৌনক বলেন, ঋগ্বেদে সাতাইশ জন ব্রহ্মবাদিনীর নাম আছে, যথা—

গোধা, ঘোষা, বিশ্ববারা, পালো, (১) পনিষৎ, নিষৎ।

ব্রহ্মজায়া জুহুর্নামা, অগস্ত্যশ্র স্বসা, দিতি (২) ॥

ইন্দ্রাগী, চেন্দ্রমাতা চ, সরমা রোমশোর্ব্বশী (৩)।

লোপামুদ্রা চ, নদ্যশ্চ (৪), যমী, নারী চ শাস্বতী ॥

(১) অপালা, উপনিষৎ। (২) অগস্ত্যশ্রস্বসা (অগস্ত্যের ভগিনী), অদিতি। (৩) রোমশা, উর্ব্বশী। (৪) নদী সমূহ।

(৮)

শ্রী, লাক্ষা, সার্পরাজী, বাকু, শ্রদ্ধা, মেধা চ, দক্ষিণা ।

রাত্রি, সূর্য্য চ সাবিত্রী, ব্রহ্মবাদিন্ত ঈরিতাঃ ॥

(শৌনকাচার্য্য প্রণীত 'বৃহদ্বেদভা' ২।৮২-৮৭)

ইহারা সকলেই মন্ত্রদ্রষ্ট্রী নারী ঋষি । শৌনক ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । ১ম,—যাঁহারা (প্রথম নয় জন । জুহুর অপর নাম ব্রহ্মজায়া । 'অগস্ত্য ভগিনী' একই নারী) স্বদৃষ্ট সূক্ত দ্বারা দেবতাদের স্তুতি করিয়াছেন । ২য়—যাঁহারা (দ্বিতীয় নয় জন । 'নারী চ শাশ্বতী' একই নারী) অন্য ঋষি বা দেবতাদের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন । ৩য়—যাঁহারা (তৃতীয় নয় জন) আত্মতত্ত্ব বা আত্মা হইতে সৃষ্টির বিবর্তন সম্বন্ধে গান করিয়াছেন । ইহারা নিজ নিজ সূক্তের দ্রষ্ট্রী ও দেবতা উভয়ই । বিশ্ববারা কেবল মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ছিলেন না, কিন্তু যজ্ঞে ঋষিকের (পুরোহিতের) কার্য্যও করিয়াছেন । ঋগ্বেদে রাণী ও শ্রী-যোদ্ধগণেরও উল্লেখ আছে, যাঁহারা পতিসহ রণক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন । ইহাদের জীবনেতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না, সেইজন্য কেবল নাম উল্লেখ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল । কয়েক জনের জীবনের দুই একটি ঘটনা 'বৃহদ্বেদভা' গ্রন্থে ও দ্যা দ্বিবেদ কৃত 'নীতিমঞ্জরী' গ্রন্থে নীতি বিশেষের উদাহরণ স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে । এস্থলে উহা বর্ণনযোগ্য মনে করি না । কয়েক জনের সম্বন্ধে কে কাহার কন্যা বা পত্নী, এই মাত্র উল্লেখ আছে,—যেমন ঘোষা কক্ষিবান ঋষির কন্যা, জুহু বৃহস্পতির পত্নী, যমী বিবস্বানের কন্যা, অপালা অত্রিহুহিতা ।

তবে মন্ত্রদ্বীপী সকলেই আপন আপন সূক্তে, মন্ত্রে চিরজীবিনী হইয়া আছেন। ঐ সকল সূক্তের পাঠ্যরসে তাঁহাদের নাম আৰুতি করা প্রত্যেক বেদপাঠীর অবশ্য প্রতিপাল্য বিধি। কারণ, ঋষি ও দেবতা না জানিয়া বেদপাঠ নিষ্ফল হয়।

ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। উহাতে ব্রহ্মবিদ্যাবীজের উচ্চ বেদীতে অধিষ্ঠিতা মহিমমণ্ডিতা নারীদের কৃতিত্ব দর্শনে আমাদের চিত্তে অতীতের ভারতীয় আৰ্য্যজাতির এমন একটী গৌরবময় সাংস্কৃতিক চিত্র স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠে, যাহা বর্তমান অপরাবিদ্যামুখী ক্ষেপীষ্ঠা নারী-প্রগতির দিনে দুর্লভ। পণ্ডিত মোক্ষমূলর (Max Muller) বলিতেন অদ্বৈতবাদ ধর্মজগতের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কৃত্য। যখন অত্যাশ্চর্য দেশ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন এ দেশের নারীরাও সেই শ্রেষ্ঠতম তত্ত্বের, সেই শাস্ত্রত সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। মন্ত্রদ্বীপী ও শাস্ত্রত সত্যদ্বীপী একই কথা।

বেদে নারীর অধিকার নাই, নারীর উপনয়ন হয় না বলিয়া, এইরূপ স্মৃতিবচন আছে। কিন্তু বৈদিক যুগে নারীরও উপনয়ন সংস্কার হইত—ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তদনুযায়ী বর্তমান সময়েও লেখকের সুপরিচিত জনৈক বাঙ্গালী বেদাধ্যাপক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের পত্নী উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন, এবং বেদবিহিত নিত্য হোমাদির অনুষ্ঠান করেন। যাহা হউক, বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যাবীজের প্রতি লক্ষ্য করিলে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিরও সম্মত যে সত্যটী আমাদের মনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহা এই

যে ব্রহ্মবিদ্যা জাতি-বর্ণের বাধা মানে না, পুংস্ত্রী-বৈষম্যের আপত্তি অঙ্গীকার করে না, বিধি-নিষেধের সীমা-সংকীর্ণতাও সহন করে না। বিহু, ধর্মব্যাধ ইহার দৃষ্টান্ত ; বৈদিক স্ত্রী-ঋষিরা ইহার সাক্ষী। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল আচার্য্যগণ বৈদিক মন্ত্র-দ্রষ্টাদের পদে নতশির।

বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী পৌরাণিক সাহিত্যে, যোগবাশিষ্ঠ ও মহাভারতে যে কয়টি ব্রহ্মবাদিনীর সন্ধান পাইয়াছি, পাঠক পাঠিকা তাঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাইবেন। 'ত্রিপুরা রহস্য' নামক প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থেও জনৈক ব্রহ্মবাদিনীর গভীরার্থপূর্ণ উপদেশরাশি রক্ষিত আছে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে উহার বিবরণ দিতে পারিলাম না।

উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে নারী শক্তি কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তাহা এই গ্রন্থোক্ত চরিতমালা হইতে উপলব্ধ হয়। ইহাদের উন্নত চরিত্র-কথা আধুনিক বঙ্গ মহিলাদের আলোচনীয় ও শিক্ষাপ্রদ হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলাম। কয়েকজনের জীবন বিবরণে বেদান্ত বিজ্ঞানের চরম তত্ত্ব নিহিত আছে, ইহাও বঙ্গ নরনারী সকলের চিন্তনীয়। আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া ইহা অনেকটা সুগম হইবে। পঞ্জাব, গুজরাত, সিন্ধুদেশ ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি সেখানকার মহিলারাও বেদান্ত কথায় প্রীতিমতী। যেখানে বেদান্ত পঠন পাঠন হয় সেখানে তাঁহারা আসিয়া আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন। স্থানে স্থানে নারীদের সম্বন্ধ আছে, যেখানে কোন সুপাঠিতা মহিলা নারী-

শ্রোতৃবর্গের নিকট ভাষানুবাদিত পঞ্চদশী, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি বেদান্তগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আবার তাঁহারা পাঠপ্রারম্ভে ও পাঠান্তে ভগবৎ নাম কীর্ত্তনও করিয়া থাকেন। ইহা আমি তাঁহাদের সমিতিতে (ওদেশে 'সংসঙ্গ' বলে) উপদেশ প্রদানার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া স্বচক্ষে দর্শন পূর্ব্বক প্রীতলাভ করিয়াছি। বঙ্গমাতারাও ভগবদভক্তি সহ জীবনের চরমতত্ত্বে, নিজ স্বরূপ-তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করুন। জীবনের উচ্চতম পরিণতি ও চরম আদর্শ করায়ত্তকরণে নারী যে পুরুষের সম্পূর্ণ সমকক্ষ—ইহা এই গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্র আখ্যান দ্বারা প্রমাণিত হয়।

ইহলৌকিক অভ্যুদয়, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ক্ষেম ও শান্তির মূলে যে নারী-শক্তি কার্য্যকরী ইহা ত বলাই বাহুল্য। ব্যক্তির সংহতিই জাতি। অতএব জাতীয় উন্নতিও নারীর উপর নির্ভর করে।

আয়ুর্বিত্তং যশঃ পুত্রাঃ স্ত্রীপ্ৰীত্যেব স্যুর্নৃণাং সদা।

নশুন্তি তে তদপ্ৰীত্যৌ তাসাং শাপাদসংশয়ম্ ॥ স্মৃতি

আয়ু, সম্পত্তি, যশঃ, সুপুত্র—মনুষ্যের এই সকল আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নারীরা প্রীত হইলে সদা লাভ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নারীর অপ্রসন্নতায় তাঁহাদের শাপে এই সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য মনু বলেন যেখানে নারী পূজিতা সেখানে দেবতারা নন্দিত,—‘নন্দন্তি তত্র দেবতাঃ’। ঋষিদের ‘এই স্পষ্ট উক্তি হইতে বুঝা যায় দৈহিক দৃষ্টিতে অবলা বলিয়া কথিত হইলেও চিত্ত-রাজ্যে নারী বহুবলধারিণী। কিন্তু ‘বাসীরাণী নারী-সমর-

(১৩০)

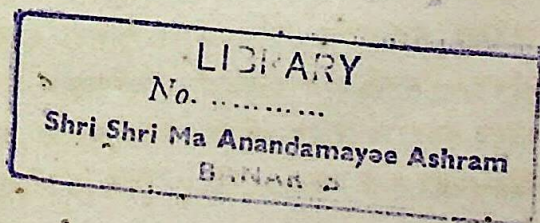
বাহিনী'র কাহিনী পাঠ করিলে নারীর আভিধানিক—‘অবলা’ নাম আর টিকিতেছে না বলিয়া মনে হয়।

বর্তমান গ্রন্থে বর্ণিত কোন কোন মহিয়সী মহিলার জীবনে গার্হস্থ্য ধর্মের সহিত যোগৈশ্বর্য্য, ব্যবহারিক জগতে নিখুঁত কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত গভীর তত্ত্বজ্ঞান, বিপুল রাজ্য সম্পদের সহিত নির্বিকারচিত্ততা অপূর্ব সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে।

‘মদালসা’, ‘কর্কটী রাক্ষসী’, ‘লীলা’ চরিত ব্রহ্মবিদ্যা মাসিক পত্রে, ‘গার্গী’ উদ্বোধন মাসিক পত্রে, ‘সুলভা’ শিবম্ মাসিক পত্রে—প্রকাশিত হইয়াছিল। তজ্জন্য পত্র সম্পাদকদিগকে ধন্যবাদ। সেই প্রবন্ধগুলি কিছু কিছু পরিবর্তন ও সংশোধন; পূর্বক এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলাম। শুভমস্তু।

কাশীধাম
বৈশাখ, ১৩৫৩। }

গ্রন্থকার।



五、五、五

১৮৮৩

2507-19115

ব্রহ্মবাদিনী

প্রথম অধ্যায়

মদালসা

(১)

মদালসা ত্রিদিববাসী গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর তনয়া। তিনি অসামান্য রূপলাবণ্যবতী এবং নানা সদগুণের আধার ছিলেন। গন্ধর্ব্বরা দেবযোনি। সুতরাং মর্ত্যলোকে দুর্লভ রূপ-গুণ-নিচয়ের সম্ভাব স্বাভাবিকভাবে তাহাদের মধ্যে থাকিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। স্বীয় জাতি-মূলভ বিচিত্র গুণাবলী মদালসার ত' ছিলই, তদুপরি তিনি ছিলেন আর একটা অমূল্য সম্পদের অধিকারী, যাহা কি দেবতা, কি মনুষ্য সকলের মধ্যেই দুর্লভ বস্তু। গন্ধর্ব্বজাতির মধ্যে ইহা আরও সুদুর্লভ। মদালসার সেই সম্পদটি হইতেছে তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যবীজ। উপনিষদ বলেন—‘ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা’—ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার আধারভূতা। মদালসা এই ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মদালসার যে চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যবীজ গন্ধর্ব্বজীবনে

অর্জিত হয় নাই, কিন্তু পূর্বজন্মসিদ্ধ সম্পদ—তিন ব্রহ্মবিদ্যায় ভূষিত হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তত্ত্বদর্শিনী মদালসার পরমার্থ-জ্ঞান বাল্যেই স্কুরিত এবং যৌবনে ও পরিণত বয়সে আরও সমুজ্জলরূপে দীপ্যমান হইয়াছিল। অতএব ইহা যে তাঁহার বহু জন্ম-জন্মান্তরীণ তপস্যা, অধ্যয়ন, বিচার, যোগ-ধ্যান-সমাধির পরিপক্ব ফল, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহার জীবনধারা এবং পুত্রাদিগকে প্রদত্ত উপদেশ হইতেও ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। এই প্রবন্ধে আমরা পাঠককে তাঁহার সেই চরম তত্ত্ব-নির্দেশক উপদেশগুলির সহিত পরিচিত করাইব। তৎপূর্বে তিনি কিরূপে একটি মানবজাতীয় রাজপুত্র-সহ উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই কাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি। ভোগ ভিন্ন প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না। প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত তত্ত্বদর্শীরও বিদেহমুক্তি হয় না। জীবন্মুক্তকেও প্রারব্ধ জন্ম সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পরমতত্ত্বদর্শী বামদেব ঋষিকেও যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট কর্মক্ষয় জন্ম গর্ভবাস করিতে হইয়াছিল,—ইহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শিনী মদালসাকেও প্রারব্ধবশাৎ জন্ম পরিগ্রহ ও বিবাহাদি ব্যবহারিক ব্যাপারের মধ্য দিয়া ভোগ পূর্বক কর্মক্ষয় করিতে হইয়াছিল।

পূর্বকালে শত্রুজিৎ নামে এক নরপতি ছিলেন। ঋতধ্বজ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। ঋতধ্বজ নানাগুণেভূষিত, উদার-চরিত্র যুবা পুরুষ। ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য্যবীর্য্যে এবং রণদক্ষতায় তাঁহার সমকক্ষ তখন কেহ ছিল না। তিনি তখনও কুমার—

বিবাহ হয় নাই। একদিন রাজসভায় গালব নামক জনৈক তপস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়া শত্রুজিৎ রাজার নিকট আবেদন জানাইলেন যে, দানবেরা সদাই তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন করিতেছে। ব্রাহ্মণের সঙ্গে একটা অশ্ব ছিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন—‘একদিন দানবগণের উপদ্রবে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া এবং প্রতিকারের কোন উপায় নাই দেখিয়া দুঃখভারাক্রান্তচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম। সেই সময়ে আকাশ হইতে এই ঘোড়াটি পতিত হইল এবং সেই সময়েই দৈববাণী আমাকে বলিল—‘এই যে অশ্বটি তোমাকে দেওয়া হইল, জল-স্থল-অন্তরীক্ষে ইহার গতি অপ্রতিহত। অনায়াসে সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ বলিয়া অশ্বটির নাম কুবলয় (কু = পৃথিবী)। রাজা শত্রুজিতের পুত্র ঋতধ্বজ এই ঘোড়ায় চড়িয়া তোমার পীড়নকারী দানবকে বধ করিবেন এবং নিজেও যশোলাভ করিবেন।’ ব্রাহ্মণের প্রার্থনানুসারে তাঁহার তপোবিঘ্ন দূর করিবার জন্য রাজা পুত্র ঋতধ্বজকে নিযুক্ত করিলেন। ঋতধ্বজ অশ্বারোহণে ব্রাহ্মণের আশ্রমে আসিলেন। পাতালকেতু নামক দুঃচার দানব শূকর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সন্ধ্যা-উপাসনারত গালব মুনিকে আক্রমণ করিতে উচ্চত হইল। মুনিশিষ্যগণ উদ্বিগ্নচিত্তে চিৎকার করিতে লাগিলেন। রাজকুমার ঋতধ্বজ তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তথায় আসিলেন এবং দানবকে শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। শরবিদ্ধ দানব সবেগে অরণ্য ও পর্বত মধ্যে প্রবেশ করিল, ঋতধ্বজের অশ্বও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান

হইল। বহুদূর আসিবার পর দানব ভূগভস্থ একটা বিস্তীর্ণ গর্ত মধ্যে প্রবেশ করিল। অশ্বারোহী ঋতধ্বজও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অন্ধকারময় সেই গর্তে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না, কিন্তু কিছু দূর গিয়া ঋতধ্বজ আলোকময় স্থান প্রাপ্ত হইলেন, এবং দেখিলেন সেই পাতাল-প্রদেশে শত শত সুবর্ণ প্রাসাদসঙ্কুল এক অপূর্ব পুরী। তিনি পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু একটি মনুষ্যকেও তথায় দেখিতে পাইলেন না—স্থানটি একেবারে মানব-বসবাসশূন্য। ঋতধ্বজ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা একটি রমণীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই রমণীকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে কোন উত্তর না দিয়া স্বরিতপদে প্রাসাদের উপরে চলিয়া গেল। ঋতধ্বজ অশ্বটিকে একস্থানে বন্ধন করিয়া রাখিয়া রমণীর অনুসরণ করিলেন এবং প্রাসাদ মধ্যে পালঙ্কোপরি সমাসীনা একটি রূপবতী তরুণীকে দেখিলেন। তরুণীও ঋতধ্বজকে দেখিলেন। দর্শন মাত্র উভয়ের মধ্যে প্রেমসঞ্চার হইল। সহসা তরুণী মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তাহার সহচরী কুন্তলা নান্নী পূর্বোক্তা রমণীর শুশ্রূষায় তরুণীর মুচ্ছা অপগত হইল। তখন ঋতধ্বজ কুন্তলার কথা হইতে জানিতে পারিলেন যে, তরুণী গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাসুর কন্যা,—নাম মদালসা। পাতালকেতু দানব-মায়া বিস্তার পূর্বক কন্যাটিকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে এবং আগামী ত্রয়োদশী তিথিতে সে উঁহাকে বিবাহ করিবে মনস্থ করিয়াছে। তরুণী এই ব্যাপারের অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন ও দুঃখার্ত হইয়া

আত্মহত্যা করিতে উত্ততা হইয়াছিলেন, এমন সময় সুরভি (দেবধেনু) বলিলেন,—‘ঐ ছরাত্মা দানব তোমাকে লাভ করিতে পারিবে না, যিনি দানবকে শরাঘাতে আহত করিবেন, তিনি তোমার পতি হইবেন।’ সুরভির কথা মিথ্যা হইবার নহে। কিন্তু এদিকে মদালসা ঋতধ্বজের প্রতি প্রীতিমতী হইয়াছেন, আর ঋতধ্বজই যে পাতালকেতুকে শরবিদ্ধ করিয়াছেন, ইহা তখন পর্য্যন্তও তিনি জানিতে পারেন নাই,—এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া চিরজীবন দুঃখেই যাপন করিতে হইবে ভাবিয়া বালিকা সহসা মূচ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, অতঃপর কুন্তলার প্রশ্নের উত্তরে ঋতধ্বজ যে আত্মবৃত্তান্ত বলিলেন, তাহাতে আর কাহারও কোন সন্দেহ বা ক্ষোভের কারণ রহিল না। ঋতধ্বজ মদালসার প্রতি প্রীতিবদ্ধ হইলেও গন্ধর্ব্বকন্যা সহ বিবাহ প্রথমতঃ অসম্ভবই মনে করিয়াছিলেন এবং পরে মদালসার মনোভাব অবগত হইয়া উহা সম্ভব বুঝিয়াও পিতামাতার অগোচরে এরূপ বিবাহ অনুচিত মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কুন্তলার সাগ্রহ প্রার্থনা ও অনুনয়-বিনয়ে বাধ্য হইয়া ঋতধ্বজ মদালসাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন, এবং সেই স্থানেই স্মরণ মাত্র আগত গন্ধর্ব্বরাজের কুলগুরু তুম্বুরর পৌরোহিত্যে উভয়ে উদ্ধাবন্ধনে বদ্ধ হইলেন। ঋতধ্বজ অশ্বপৃষ্ঠে মদালসা সহ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিবেন এমন সময়ে সসৈন্য পাতালকেতু আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু ঋতধ্বজ অনায়াসে পাতালকেতু সহ সমগ্র দানববাহিনী ধ্বংস

করিয়া বিজয়ী হইলেন। তিনি মদালসা সহ স্বগৃহে আগমন পূর্বক পিতৃপদে প্রণত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পিতা সব শুনিয়া কহিলেন,—‘তুমি তপোবিঘ্নকারী দানবদিগকে বধ করিয়া মুনিদিগকে যে ভয় হইতে ত্রাণ করিয়াছ, ইহাতে আমি ধন্য হইলাম এবং আমাদের বংশের গৌরব ও যশ বহুলীকৃত হইল। আমি আশীর্বাদ করি এই কল্যাণীয়া গন্ধর্ব্বতয়া মদালসা যেন তোমার সহিত কখনও বিযুক্তা না হন।’ ঋতধ্বজ মদালসা সহ রাজপুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা মহারাজ শত্রুজিতের আদেশে ঋতধ্বজ আর্তত্রাণ ব্রত গ্রহণ পূর্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া দৈত্য-দানবকৃত মুনিদিগের তপোবিঘ্ন দূরীকরণে নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভাতে সেই অপ্রতিহতগতি দৈব অশ্ব কুবলয়-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক কোথায় কোন্ ছুষ্ট দানব কাহার প্রতি অত্যাচার করিতেছে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন এবং অত্যাচারীকে দমন ও বিপন্নকে ভয়মুক্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন। সেই সময়ে পাতালকেতুর অনুজ তালকেতু মুনিবেশ ধারণ পূর্বক যমুনাতে আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল ভ্রাতৃঘাতী ঋতধ্বজের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা, কিন্তু দানবরূপে ঋতধ্বজের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মুনি-ছদ্মবেশে তালকেতু ঋতধ্বজ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—‘হে রাজপুত্র! আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, কখনও কাহারও প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না।

আমি একটি যজ্ঞ-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু দক্ষিণা দিবার উপযুক্ত অর্থ আমার নাই। আপনার সুবর্ণ কণ্ঠহারটি আমাকে দান করিয়া উপকার করুন। আর আমি তপস্কার্থ জলমধ্যে প্রবেশ করিতেছি, যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ আমার আশ্রমটি রক্ষা করুন।’ রাজকুমার তৎক্ষণাৎ কণ্ঠ হইতে সুবর্ণ হার উন্মোচন করিয়া মায়া-মুনি তালকেতুকে প্রদান করিলেন এবং আশ্রম রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে ঋতধ্বজের অজ্ঞাতসারে সেই মায়াবী দানব জল হইতে উথিত হইয়া শত্রুজিতের রাজধানীতে গিয়া রাজা, মদালসা ও অন্যান্য সকলের সম্মুখে বলিল,—‘রাজন, কুবলয়াশ্ব ঋতধ্বজ কোন দানব সহ যুদ্ধে হত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে এই স্বর্ণহারটি আমাকে দিয়াছেন। হারটি আপনি গ্রহণ করুন। আমি তপস্বী, সুবর্ণে আমার কি প্রয়োজন?’ রাজপুরী শোকে নিমগ্ন হইল। পতি-বিয়োগিনী মদালসা তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা ও রানী মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহারা শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা অতীতের হিন্দুজাতির গৌরবোজ্জ্বল উচ্চ আদর্শের ও মহান্ কর্ত্তবানিষ্ঠার জ্বলন্ত উদাহরণ স্বরূপ। রাজা বলিলেন,—‘আমার পুত্র যখন ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন কিছুতেই শোচনীয় নহেন। পতির অনুগামিনী সাক্ষী মদালসাও অনুশোচনীয় নহেন। পুত্র জীবন দিয়াও আমার আদেশ ও কর্ত্তব্য পালন দ্বারা আমার নিকট এবং ধর্ম্মের নিকট অত্মদান হইলেন।’

পতিকে সম্বোধন করিয়া রাণী বলিলেন,—‘রাজন, মুনিকে পরিভ্রাণ করিতে করিতে আমার সন্তান নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আজ যেরূপ সুখী হইলাম, মাতা বা ভগিনী কাহার দ্বারা আমি এই প্রকার সুখী হইতে পারি নাই। যাহারা শোচনীয় বান্ধবগণের নিমিত্ত অতি দুঃখে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ব্যাধিক্রিষ্ট হইয়া জীবন বিসর্জন করে, তাহাদিগের মাতা বুঝা সন্তান-জননী। যাহারা গো বা দ্বিজগণের রক্ষণবিষয়ক সংগ্রামে নির্ভীকচিত্তে যুধ্যমান হইয়া শত্রুকুল হইয়া বিপন্ন হয়, পৃথিবীর মধ্যে তাহারাই মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। পুত্র যখন সংগ্রামে নিহত হয় বা শত্রু জয় করিয়া প্রত্যাভূত হয়, তখন স্ত্রীলোকের গর্ভক্লেশের সফলতা জন্মিয়া থাকে’ (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)।

(২)

এদিকে তালকেতু দানব যমুনাজল হইতে উত্থিত হইয়া ঋতধ্বজকে বলিল,—‘রাজকুমার, আপনার অবিচলিত কর্তব্য-নিষ্ঠার ফলে আমি বরুণের যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছি। আপনি এক্ষণে গমন করুন।’ ঋতধ্বজ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া পিতামাতার চরণ বন্দন করিলেন। তাহারা ও অন্যান্য সকলে ঋতধ্বজকে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত ও হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। পিতামাতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া

ঋতধ্বজ সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ঋতধ্বজ মদালসাকে দেখিতে না পাইবার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। পিতা তাঁহাকে তালকেতু আসিয়া যাহা বলিয়াছিল তাহা এবং মদালসার প্রাণত্যাগের কথা বলিলেন। ঋতধ্বজ শোকার্ত হইলেন। সাধ্বী পত্নীর অপরিসীম প্রেমে অভিভূত ঋতধ্বজ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি জীবনে আর অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করিবেন না।

পাতাল প্রদেশে অবস্থিত নাগপুরীর দুইটি নাগরাজকুমার ঋতধ্বজের প্রিয় বয়স্কা ছিলেন। তাঁহারা ঋতধ্বজের গুণাবলী ও বন্ধুবৎসলতায় এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, প্রতিদিন নরবেশ ধারণপূর্বক তাঁহার নিকট আসিতেন, এবং সমস্ত দিন তৎসহ ক্রীড়া ও আহার-বিহারে অতিবাহিত করিয়া নাগপুরে ফিরিয়া যাইতেন। নাগরাজ অশ্বতর নিজ পুত্রদ্বয় সহ ঋতধ্বজের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের কথা শুনিয়া তাঁহাকে মণিমুক্তাদি মূল্যবান উপঢৌকন দিবার প্রস্তাব করিলেন। পুত্রদ্বয় কহিলেন,—‘ঋতধ্বজের পিতৃভাণ্ডারে মণিমুক্তার অভাব নাই, প্রতিদিন তিনি ঐ সকল মহার্ঘ বস্তু বহুল পরিমাণে দান করিয়া থাকেন, সুতরাং উহা দ্বারা তাঁহার বন্ধুত্বের প্রতিদান কিছুই হইতে পারে না।’ অশ্বতর ভাবিলেন, ঋতধ্বজের উপকারার্থ কিছু করা একান্ত কর্তব্য। তারপর তিনি মদালসার প্রাণত্যাগ ও ঋতধ্বজের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিলেন। পুত্রদ্বয় পিতাকে বলিলেন—‘এ বিষয়ে যদি কিছু করা সম্ভব হয়, তবে তাহা

বিবেচ্য, কিন্তু মদালসার সহিত ঋতধ্বজের পুনঃসংযোগ ত
 এক্ষণে ঈশ্বরেরও অসাধ্য !’ অশ্বতর বলিলেন,— জগতে অসম্ভব
 কিছুই নাই। পৌরুষ ত্যাগ না করিয়া কার্য্য করাই উচিত।
 আমি তপস্যা দ্বারা এই কার্য্য সংসাধন করিব,—অসম্ভব সম্ভব
 করিব।’ এই কথা বলিয়া নাগরাজ অশ্বতর হিমালয়ের
 প্লক্ষাবতরণ নামক তীর্থে গমন করিয়া কঠোর তপশ্চরণ পূর্ব্বক
 সর্ব্বশুভময়ী জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মযোনি সরস্বতী দেবীর আরাধনায়
 তৎপর হইলেন। দেবী প্রসন্ন হইলেন, এবং আবির্ভূতা
 হইয়া বলিলেন,—‘নাগরাজ, যথাভিলষিত বর গহণ কর।’
 অশ্বতর নিজের জন্ম ও তাঁহার ভ্রাতা কশ্মলের জন্ম সঙ্গীত-
 বিদ্যায় অনন্তসাধারণ পারদর্শিতা লাভ রূপ বর প্রার্থনা
 করিলেন। দেবী তাঁহাকে ‘তোমরা দুই ভ্রাতাই আমার বরে
 অদ্বিতীয় সঙ্গীতবিদ্যাবিৎ হইবে’ এই বর দিয়া অতৃপ্ত
 হইলেন। তৎপর তাঁহারা দুই ভাই কৈলাসশৃঙ্গে উপনীত
 হইয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক তত্ত্বীয় সহযোগে সপ্তম্বরে গান দ্বারা
 মহেশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। বহু দিবস অতীত
 হইবার পর দেবদেব মহাদেব সঙ্গীতে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে
 বর প্রদানার্থ আবির্ভূত হইলেন। অশ্বতর বলিলেন,—‘হে
 দেবদেব, যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দান
 করুন—কুবলয়াশ্বের স্ত্রী মদালসা যে বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে,
 সেই বয়সেই এবং পূর্ব্ববৎ কাস্তিমতী, জাতিস্মরা, যোগিনী
 ও যোগজননী হইয়া আমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করুন।’

মহাদেব कहিলেন,—‘হে নাগশ্রেষ্ঠ, আমার প্রসাদে তাহাই হইবে।’ তৎপর দেবদেব যে উপায়ে উহা সিদ্ধ হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়া অন্তর্ধান করিলেন। নাগপতি গৃহে ফিরিয়া শিবপ্রদত্ত উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে তাহার মধ্যম ফণা হইতে শ্বাসত্যাগকালে পূর্ব্ববৎ দেহ-রূপ-গুণ-বয়স-আকৃতি-সম্পন্ন মদালসা পুনরুৎপন্ন হইলেন। নাগরাজ মদালসাকে স্ত্রীগণের মধ্যে গুপ্তভাবে রাখিলেন, কাহারও নিকটে এ-বিষয়ে কিছু প্রকাশ করিলেন না। নাগরাজ পুঞ্জদ্বয়কে বলিলেন,—‘তোমরা ঋতধ্বজকে একবার আমার সমীপে লইয়া আইস। তোমাদিগকে পূর্ব্বেও ইহা একবার বলিয়াছিলাম, কেন তাহা করিতেছ না?’ কুমারদ্বয় ঋতধ্বজকে তাঁহাদের গৃহে আনয়নের জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। কিন্তু যখন ঋতধ্বজ শুনিলেন যে, নাগপতি অশ্বতর স্বয়ং তাঁহাকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আর কোন আপত্তি না করিয়া নাগপতিকে উদ্দেশে প্রণাম পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজকুমার ঋতধ্বজ প্রিয়তম বয়স্শযুগলের সহিত গোমতী নদীর মধ্য দিয়া পাতাল-পুরে উপস্থিত হইলেন এবং নাগরাজের রাজধানীর সম্পদ ও সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইলেন। বন্ধুদ্বয় রাজ-পুত্রকে পিতৃসমীপে লইয়া গিয়া ‘ইনিই সেই বীর কুবলয়াশ্ব’ এই বলিয়া তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলেন। ঋতধ্বজ পন্নগপতির চরণে প্রণত হইলেন। অশ্বতর ঋতধ্বজের আগমন

উপলক্ষে মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। পরে তিনি ঋতধ্বজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—‘হে ভদ্র, তুমি আমার গৃহে আসিয়াছ, পিতার নিকট পুত্রের ত্রায় সমস্ত শঙ্কা ত্যাগ করিয়া ভূমি, সুবর্ণ, রজত, বসন, বাহনাদি যে কোন ভোগ্যবস্তু ইচ্ছা হয় বল, উহা দুর্লভ হইলেও আমি তোমাকে দিব।’

ঋতধ্বজ,—‘ধনরত্নাদিতে আমার পিতার গৃহ পূর্ণ। তাঁহার প্রদত্ত অসংখ্য সুবর্ণাদি আমি অকাতরে বিতরণ করিয়া নিত্যই অর্থীদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকি। অতএব আমার প্রার্থনীয় কিছুই নাই। আমি এখনও পিতার বাহু-তরুচ্ছায়ায় বাস করিতেছি, আমার অভাব কিসের? বিশেষতঃ, আমি যখন স্বীয় মস্তক দ্বারা আপনার চরণ স্পর্শ করিতে পারিয়াছি, তখন সবই প্রাপ্ত হইয়াছি মনে করি।’

নাগরাজ ঋতধ্বজের বিনয়ে মুগ্ধ হইলেন। তিনি পুনরায় তাঁহাকে যথাভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তথাপি ঋতধ্বজ কিছুই প্রার্থনা করিতে সম্মত হইলেন না। তখন নাগরাজ বলিলেন,—

‘কুবলয়াশ্ব, তুমি আমার গৃহে আসিয়াছ। তোমাকে আমার কিছু দিতেই হইবে, এবং তোমাকে কিছু গ্রহণ করিতেই হইবে। যদি ধনরত্নাদি বা অন্য কোন ভোগ্যবস্তু না গ্রহণ কর, তবে মর্ত্যালোকে যাহা দুঃপ্রাপ্য এবং যাহা তুমি চাহিলেও কখনও লাভ করিবার আশা করিতে পার না, তুমি বলিলেই ঐরূপ কোন বস্তু আমি তোমাকে দিব।’

যিনি মদালসার স্মৃতি বিরহকাতর হৃদয়ে সদাই বহন করিতেছিলেন, অথচ মদালসাকে পাইবার কোন আশাই যিনি করিতে পারেন না, সেই ঋতধ্বজের চিন্তে তখন ঐ কথাই উদয় হইল। কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ পিতৃতুল্য অশ্বতরকে কিছু বলিতে না পারিয়া বয়স্হ দু'জনের প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা ঋতধ্বজের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া পিতাকে পূর্ব প্রার্থনা স্মরণ করাইয়া বলিলেন—‘হে পিতঃ, ঋতধ্বজ তালকেতু নামক এক দানবের মায়ায় বঞ্চিত হইয়া সাক্ষী পত্নী গন্ধর্ব্বরাজ-তনয়া মদালসাকে হুরাইয়া ব্যথিত চিন্তে কাল যাপন করিতেছেন, এবং অন্য কোন স্ত্রীকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইনি মদালসাকে দেখিবার জন্য একান্ত উৎকণ্ঠিত। যদি তাহা সংঘটন করিতে পারেন, তবেই ইহার উপকার করা হয়।’ অশ্বতর বলিলেন যে, একবার পঞ্চভূতের সহিত বিয়োগ ঘটিলে পুনরায় সংযোগ স্বপ্ন বা আশুরী মায়া ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নহে। ঋতধ্বজ প্রেম ও লজ্জাসহকারে ভূজঙ্গপতিকে কহিলেন,—

‘আপনি যদি আমাকে মায়া দ্বারাও মদালসাকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার প্রতি পরম অনুগ্রহ করা হইবে।

অশ্বতর কহিলেন,—‘হে বৎস, যদি মায়া দর্শনে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে দেখ।’ এই কথা বলিয়া নাগরাজ গুপ্ত গৃহ হইতে মদালসাকে আনাইলেন, এবং বলিলেন—‘হে বৎস, তোমার পত্নী মদালসা এই কিনা দেখ !’

রাজকুমার মদালসাকে দেখিবা মাত্র লজ্জা ত্যাগ করিয়া
 আবেগ-ভরে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। অশ্বতর ঋতধ্বজকে
 নিষেধ করিয়া বলিলেন,—‘হে পুত্র, ঐ মায়া-মূর্ত্তিকে স্পর্শ
 করিও না, স্পর্শ করিবা মাত্র উহা আর থাকিবে না।’ ঋতধ্বজ
 ইহা শুনিয়া মূচ্ছিত হইলেন। মদালসা তাঁহার প্রতি
 ঋতধ্বজের অকৃত্রিম ও অবিচলিত স্নেহের নিদর্শন পাইয়া মুগ্ধ
 হইলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন—নাগরাজ আমাকে যে
 মায়া বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহা ত ঠিকই। পৃথিবী জল
 ইত্যাদি পঞ্চভূতের সমবায়ে যে-দেহের জন্ম, তাহাকে মায়া
 ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? মদালসা যে আজন্ম
 ব্রহ্মবিদ্যুযী ছিলেন, এই উক্তি তাহার পরিচায়ক। যাহা হউক,
 অশ্বতর ঋতধ্বজকে আশ্বাসিত করিয়া কিরূপে তপস্যা দ্বারা
 মৃত্যু মদালসাকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন, সেই বৃত্তান্ত বলিলেন।
 ঋতধ্বজ মদালসাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া হর্ষবিপ্লুতচিত্তে সীম
 অশ্বরত্ন কুবলয়কে স্মরণ করিলেন। অশ্ব তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে
 উপস্থিত হইল। তিনি মদালসাকে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ
 পূর্ব্বক স্বর্গহে আগমন করিলেন এবং উভয়ে পিতামাতার
 চরণবন্দন করিলেন। রাজা ও রাণী সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া
 বিস্ময় ও আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। রাজপুরীতে পৌরবর্গ
 মধ্যে মহোৎসব চলিতে লাগিল।

সময়ে রাজা শত্রুজিৎ কালধর্ম্মের বণবর্তী হইয়া দেহত্যাগ
 করিলেন। পুরবাসিগণ উদারচাচরচেষ্টিত মহাত্মা ঋতধ্বজকে

রাজসিংহাননে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি পুত্রনির্বিশেষে
 প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। মহারাণী মদালসার গর্ভে তাঁহার
 প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পিতা পুত্রের নাম রাখিলেন
 ‘বিক্রান্ত’। রাজ-প্রাসাদের নানা ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়াও
 মদালসা তত্ত্বদশিনী। পুত্রের নামকরণ শুনিয়া তিনি হাসিতে
 লাগিলেন। ক্রোড়স্থ শিশুপুত্র বিক্রান্তকে, এবং পরে তাহার
 অন্তর্জ ভ্রাতৃদ্বয়কে তিনি যে সকল তত্ত্ববাণী শুনাইয়াছিলেন,
 আমরা পাঠকের নিকট তাহা উপস্থাপিত করিব—ইহা প্রারম্ভেই
 বলিয়াছি। নবজাত পুত্র রোদন করিতেছে,—যেমন শিশুরা
 সাধারণতঃ রোদন করে এবং মাতারা উহাদিগকে যেরূপে শান্ত
 করে, তাহা সকলেই জানেন। মদালসা তাঁহার রোরুদ্রমান
 শিশুকে ঐ সকল পরিচিত উপায়ে শান্ত করিতেছেন না, কিন্তু
 উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শিশুর কর্ণে প্রবেশ করাইয়া উহাকে শান্ত
 করিতেছেন। একরূপ দৃশ্য কেহ কখনও দেখিয়াছেন বা একরূপ
 কথা কেহ কখনও শুনিয়াছেন কিনা, জানি না। না দেখিলে
 বা না শুনিলেও সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইহাকেই বলে
 প্রকৃতপক্ষে ‘শান্ত’ করা। ইহার পরিণাম দেখিয়া তাহাই আমরা
 বলিতে বাধ্য হইতেছি, কারণ সেই ‘শান্ত’ পুত্রকয়টি শেষে ‘সন্ত’
 হইয়া রাজ্য, ঐশ্বর্য, ভোগ-বিলাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।
 সেই কাহিনী পূর্বে বলিয়া মদালসার উপদেশ বাক্য কয়েকটি
 উদ্ধৃত করিব।

(৩)

ক্রোড়স্থ শিশু বিক্রান্তকে তাহার মাতা মদালসা ব্রহ্মজ্ঞান দিতে লাগিলেন। শিশু ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিল, মাতার তত্ত্বজ্ঞানোপদেশও পূর্ববৎই চলিতে লাগিল। পিতার নিকট বিক্রান্ত ব্যবহারিক বিদ্যা ও বুদ্ধি বিষয়ে উন্নতলাভ করিল, আর মাতার উপদেশে আত্মজ্ঞান অর্জন করিতে লাগিল। শেষে অণু বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাব অতিক্রম করিয়া মাতার উপদেশই বিক্রান্তের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিল। 'প্রজ্ঞানোদয়' হেতু বিক্রান্ত গার্হস্থ্য ধর্মে একেবারে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে ঋতধ্বজের দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পিতা উহার নাম রাখিলেন সুবাহু,—শুনিয়া মদালসা হাসিতে লাগিলেন। তিনি সুবাহুকেও তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দিতে লাগিলেন। ফলে দ্বিতীয় পুত্রটিও সাংসারিক ব্যাপারে স্পৃহাশূন্য হইল। তৎপর তৃতীয় পুত্রের জন্ম হইল, পিতা উহার নাম রাখিলেন শক্রমর্দন। নাম শুনিয়া মদালসা বহুক্ষণ হাস্য করিলেন। মাতার অমোঘ শিক্ষায় তৃতীয় পুত্রটিও সাংসারিক বিষয়ে কামনাশূন্য হইয়া পড়িল। অবশেষে চতুর্থ পুত্রের জন্ম হইল। এবার রাজা নিজে পুত্রের নামকরণ না করিয়া মদালসার দিকে দৃষ্টিপাত করায় তিনি হাসিলেন। রাজা বলিলেন,—

আমি প্রথম তিন পুত্রের যখন যখন নামকরণ করিয়াছি, তখন তখন তুমি উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছ। আমার মতে ঐ

সকল ক্ষাত্ররাজোচিত নাম ভালই হইয়াছে। অতএব তোমার হাসিবার কারণ কি ছিল, জানি না। যাহা হউক এবার তুমিই চতুর্থ কুমারের নাম রাখ।

মদালসা বলিলেন,—‘রাজন, আপনার আদেশ প্রতিপালন করা আমার কর্তব্য। আমি এই পুত্রের নাম রাখিলাম ‘অলর্ক’। আপনার এই পুত্রটী মহাবুদ্ধি হইবে’। অলর্ক অর্থে পাগলা কুকুর। রাজা এই নাম শুনিয়া বলিলেন—

‘হে কল্যাণি, তুমি এই পুত্রের যে নাম রাখিলে, উহা বড়ই অসঙ্গত। ইহার অভিপ্রায় কি?’ মদালসা উত্তর করিলেন—

‘মহারাজ, নামকরণ লোকাচার ও কল্পনা মাত্র। নাম রাখিতে হয় বলিয়াই একটা নাম রাখিলাম। আপনি যে সকল নাম রাখিয়াছেন, তাহারও কোন প্রকার অর্থ নাই। শ্রবণ করুন—যে সকল ব্যক্তি প্রাজ্ঞ, তাঁহারা আত্মকে সর্বব্যাপী বলিয়া কীর্তন করেন। এক দেশ হইতে অন্য দেশে গত্যেকি ‘ক্রান্তি’ বলে। আত্মা সর্বগত, সর্বব্যাপী ও দেহের ঈশ্বর। সুতরাং তাঁহার গতি সম্ভবে না। এই কারণে আমার বিবেচনায় ‘বিক্রান্ত’ নামের কোন অর্থ নাই। হে মহীপতে, আত্মা সর্বপ্রকার মূর্তিহীন, অতএব আপনি যে দ্বিতীয় পুত্রের ‘সুবাহু’ নামকরণ করিয়াছেন, তাহারও কোনরূপ অর্থ হইতে পারে না। তৃতীয় পুত্রের যে ‘শক্রমর্দন’ নামকরণ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাহাও অসম্বন্ধ। তাহার কারণ

শ্রবণ করুন। একমাত্র আত্মা সকল শরীরেই বিরাজমান
আছেন। সুতরাং তাঁহার শত্রুই বা কে, মিত্রই বা কে?
ভূতের দ্বারাই ভূতগণ মর্দিত হইতে পারে। যিনি মূর্ত্তিহীন,
তাঁহার আবার 'মর্দন' কিরূপে সম্ভবে? ক্রোধ প্রভৃতি ভাব
হেতু এই প্রকার কল্পনাও অর্থশূন্য হয়। কেননা আত্মা সর্ব-
প্রকার দোষশূন্য, তিনি কি প্রকারে শত্রুকে মর্দন করিবেন?
যদি লোকাচার হেতুই এই প্রকার অর্থহীন নামের কল্পনা করা
হয়, তাহা হইলে আমি যে 'অলর্ক' নামকরণ করিয়াছি, তাহা
কি প্রকারে আপনার মতে অর্থহীন হইতে পারে?' (বদ্ব-
বাসীর অনুবাদ)

জ্ঞানদৃষ্টিতে কথিত মদালসার এই সমস্ত কথাই রাজা
অনুমোদন করিলেন। কিন্তু অলর্ককেও যখন মদালসা তত্ত্বজ্ঞান
দিয়া নিবৃত্তি-পথে চালিত করিতেছিলেন, তখন স্বাত্ত্বজ্ঞান আপত্তি
করিলেন এবং মূঢ় ভৎসনা সহকারে তাঁহাকে বলিলেন—'তুমি
এ কি করিতেছ? আত্মজ্ঞান দিয়া পূর্ব্ব তিনটী পুত্রের যে অমঙ্গল
করিয়াছ, অলর্কেরও কি তাহাই করিবে? যদি আমার
প্রিয়কার্য্য করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে ইহাকে প্রবৃত্তি-
মার্গে নিয়োজিত কর। নতুবা বংশের রাজধর্ম্ম ও কর্ম্মমার্গ
উচ্ছিন্ন হইবে। এবং পিতৃপুরুষগণ লুপ্ত-পিণ্ডোদক হইবেন।'

মদালসা পতির বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া অলর্ককে ক্ষত্রিয়
রাজার কর্তব্য এবং রাজনীতি, রাজ্যশাসন, প্রজাপালন ইত্যাদি
বিষয়ে বিস্তারিতভাবে সমুচিত উপদেশ দিয়া কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত

করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, রাজধর্ম, প্রজাধর্ম, সদাচার, সার্বজনীন সন্নীতি বিষয়ে তিনি পুত্রকে যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার সর্বশাস্ত্র পারদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহারা বিস্তারিত জানিতে চাহেন, তাঁহারা মার্কণ্ডেয় পুরাণ দেখিবেন। সংক্ষেপতঃ ও সাধারণ ভাবে ভাবী রাজা অলর্কের প্রতি মদালসার কয়েকটি উপদেশবাণী নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—

(১) হে পুত্র, সংবর্দ্ধিত হও। মিত্রগণের উপকারার্থ এবং শত্রু কুলের বিনাশার্থ কস্মানুষ্ঠানদ্বারা আমার পতির অন্তর আনন্দিত কর। হে পুত্র, তুমি ধন্য, কারণ তুমি নিঃশত্রু হইয়া বহুকাল বশুমতী পালন করিবে। তোমার প্রজাপালন গুণে যাবতীয় লোকেরই যেন সুখসঞ্চার হয়। তাহা হইলেই পরমধর্ম সঞ্চয় বশতঃ অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে।

(২) হে বৎস, তুমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সুহৃদগণের আনন্দ সম্পাদন করিবে, বন্ধুবর্গের রক্ষা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, এবং গো ও দ্বিজ-কুলের রক্ষা বিধানার্থ সমরে দুষ্টগণের ও অরাতিবর্গের বিনাশ সাধন পূর্বক পরলোকে প্রস্থান করিবে।

(৩) হে বৎস, রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া স্বধর্মানুসারে প্রজারঞ্জন করাই নরপতির প্রথমতঃ কর্তব্য। সপ্তমূলবিনাশক ব্যসন পরিত্যাগপূর্বক যাহাতে কৃত মন্ত্রণার বহির্গমন না হয়, সেইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া নরপতির অবশ্য কর্তব্য, কারণ মন্ত্রণা প্রকাশে অরাতির অভিভব হয় না।

রাজার সপ্তমূল বা প্রকৃতি = স্বামী, অমাত্য, সূহৃদ, কোষ, দণ্ড, রাষ্ট্র ও পুর। বাসন = যুগয়া, দূত, দিবানিদ্ৰা, পরনিন্দা, বেশ্যাসঙ্গ, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, বৃথা ভ্রমণ, পান, দুষ্টতা, দোরাণ্ডা, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষা, প্রতারণা। কটুক্তি ও নিষ্ঠুরাচরণ।

(৪) নরপতি কামের বশবর্তী না হইয়া স্থান, বুদ্ধি ও ক্ষয় অবগত হইবেন, এবং তাঁহাকে সন্ধি-বিগ্রহাদি ষড়গুণে গুণবান হইতে হইবে। প্রথমতঃ আপনাকে, তৎপর অমাত্যগণকে, তৎপর ভৃত্যসমূহকে, পরে পৌরবর্গকে বশীভূত করিয়া অবশেষে অরাতিসহ বিরোধ করিবেন। যিনি প্রথমে আত্মা প্রভৃতিকে পরাজয় না করিয়া শত্রুগণকে পরাজয় করিতে বাসনা করেন, সেই অজিতাত্মা মহীপতি অমাত্য কর্তৃক বিজিত হইয়া অরাতিকুলের বশীভূত হইয়া থাকেন। হে পুত্র, এই হেতু প্রথমতঃ কামাদি রিপুগণকে জয় করিতে হইবে। ... কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মান ও হর্ষ—ইহারাই অরি, ইহারাই রাজাদিগের বিনাশের কারণ। পাণ্ডু নরপতি কামবশতঃই নিপাতিত হইয়াছেন, ক্রোধবশেই অনুল্লাদকে পুত্রধনে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে, লোভবশতঃ ঐল বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন, মদবশে বেণ রাজাকে বিপ্রগণ কর্তৃক নিহত হইতে হইয়াছে, ... বলি অভিমান হেতু নিপাতিত হইয়াছেন এবং পুরঞ্জয়কে হর্ষবশেই নিধনপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু রাজা মরুত ঐ সমস্ত রিপুকে পরাজয় করিয়া অখিল সংসার জয় করিয়াছিলেন।

(৫) স্বীয় কৰ্ম্ম দ্বারা আয়ানুসারে অর্থ উপার্জন করিয়া

ভক্তিসহকারে যথাযথ বিধানে পিতৃ, দেবতা ও অতিথিগণের তৃপ্তিবিধান ও আশ্রিতগণের পোষণ করিবে। ভৃত্য, দীন, অন্ধ, পতিত ও পশুপক্ষিগণকে শক্তি অনুসারে অন্নদান দ্বারা পালন করিতে হইবে।

(৬) সত্য, শৌচ, অহিংসা, অনন্যুয়া (গুণে দোষারোপ না করা), ক্ষমা, আনুগত্য (অনিষ্ঠুরতা), অকুপণতা ও সন্তোষ—এই আটটিই বর্ণনির্বিশেষে সকলের সাধারণ ধর্ম বলিয়া পরিকীর্তিত।

(৭) অসৎ বাক্য, অনৃত বাক্য ও কর্কশ বাক্য পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য, এবং অসৎশাস্ত্র, অসৎবাদ ও অসৎসেবাও পরিত্যাগ করিবে।

(৮) হে বৎস, দেবতা, বেদ, ব্রাহ্মণ, সৎনিষ্ঠ মহাত্মা, গুরুজন, পতিব্রতা স্ত্রী, যজ্ঞশীর্ণ ও তপঃপরায়ণ ব্যক্তি—ইহাদের পরিত্যাগ বা পরিহাস করা কর্তব্য নহে। প্রজ্ঞাবান, অপিশুন (পরোক্ষে পরনিন্দাবর্জনকারী), শক্তিমান এবং যাহারা কার্যে উद्यোগশীল—তাদৃশ ব্যক্তিগণের সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিবে।

(৯) লোকের যাহা যাহা প্রিয়তম এবং গৃহে যে কোন প্রিয়বস্তু বিদ্যমান থাকে, গুণবান ব্রাহ্মণগণকে তাহাই প্রদান করা উচিত (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বস্তু থাকিতে নিকৃষ্ট বস্তু দেওয়া প্রশংসনীয় নহে)। দান করিলে সেই পুণ্যফল অক্ষয় হইয়া থাকে।

(১০) প্রত্যহ বেদ পাঠ করিবে, সম্যকরূপে বিবেচনাশীল

হইবে, ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জন করিবে এবং সময়ে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।

(১১) হে পুত্র, যদ্বারা আত্মা জুগুপ্সিত (নিন্দিত) না হয়, এবং যাহা মহাজন সমীপে (অবৈধ কার্য্যজ্ঞ) গোপনীয় নহে, নিঃশঙ্ক হইয়া তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। ইত্যাদি।

অলর্ক এইরূপে মাতার নিকট সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পিতার আদেশবর্তী হইয়া রহিলেন। বহুকাল রাজত্ব করিবার পর মহারাজ ঋতধ্বজ অন্তিম বয়সে অলর্ককে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তপস্চার্য্য মদালসা সহ বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। যাইবার সময় মদালসা পুত্রের মঙ্গলার্থে যে শেষবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা এই—

‘হে পুত্র, তুমি গৃহস্থ। গৃহস্থ সদাই মমত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। সেই জন্ত তোমাকে যাহা বলিতেছি তাহা শুনিয়া রাখ। রাজ্যশাসনকালে যখন তোমার কোন প্রিয়জনের বিয়োগ জন্ত, অথবা শত্রুসৃষ্ট বিপদ জন্ত, অথবা অর্থক্ষয় জন্ত দুঃসহ দুঃখ উপস্থিত হইবে, তখন আমার প্রদত্ত অঙ্গুরীয় হইতে পত্র বাহির করিয়া উহাতে লিখিত শাসন পাঠ করিও।’

এই কথা বলিয়া মদালসা অলর্ককে নিজ অঙ্গুরীয় দান এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া পতিসহ বনগমন করিলেন।

অলর্কের দ্বিতীয় ভ্রাতা সুবাহু ইতিপূর্বেই মাতা কতৃক তত্ত্ব জ্ঞানোপদিষ্ট হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক বনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। অলর্ক যথাবিধানে রাজ্যশাসন করায় সকলের

প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার কতকগুলি পুত্র হইয়াছিল। কিন্তু বহুদিন যথেষ্ট বিষয় ভোগ করিয়াও অলর্কের তৃপ্তি হইল না, বরং উত্তরোত্তর অধিকতর ভোগাসক্ত হইয়া পড়িলেন। ইহা শুনিয়া সুবাহু দুঃখিত হইলেন, এবং ভ্রাতার তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অশ্রু কোন উপায় সফল হইবে না মনে করিয়া সুবাহু অলর্কের শত্রু কানীরাজের শরণাপন্ন হইয়া পিতৃরাজ্য লাভের বাসনা জানাইলেন। কানীরাজ সুবাহুকর্তৃক প্ররোচিত হইয়া দূত প্রেরণ পূর্বক অলর্ককে জানাইলেন যে, সুবাহুকে রাজ্য দান করিতে হইবে, নতুবা অলর্কের রাজ্য আক্রমণ করিবেন। অলর্ক উত্তরে জানাইলেন যে তাঁহার অগ্রজ সুবাহু প্রণয় সহকারে রাজ্য প্রার্থনা করুন, কিন্তু কানীরাজের আক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া রাজ্য দিবেন না। কানীপতি বিপুল বাহিনী লইয়া এবং অধীনস্থ সমস্ত নৃপতিগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া অলর্কের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। বহুদিন যুদ্ধ চলিল। অলর্ক পরাজিত হইলেন না। পরে কানীরাজ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি অলর্কের দুর্গপাল ও সামন্তগণকে অর্থ দ্বারা, ভেদ দ্বারা ও সাম দ্বারা নিজ বশে আনয়ন করিলেন। অলর্কের রাজধানী অবরুদ্ধ হইল। অরাতিচক্রে প্রপীড়িত হইয়া তিনি দিন দিন ক্ষীণবল ও ক্ষীণকোষ হইয়া পড়িলেন। এই মহাবিপদের সময়ে জননী মদালসা প্রদত্ত অঙ্গুরায়ের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল।

তিনি অঙ্গুরীয়নিবদ্ধ শাসনপত্র বাহির করিয়া পাঠ করিবা মাত্র তাঁহার শরীর পুলকে পূর্ণ ও চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইল। সুস্পষ্ট অক্ষরে সেই শাসনে লিখিত ছিল—

“সর্বতোভাবে সঙ্গ ত্যাগ করিবে। যদি তাহা না পার, তবে সাধুসঙ্গ করাই কর্তব্য। সর্বতোভাবে কাম ত্যাগ কুরাই বিধেয়। যদি তাহা না পার, তবে মুক্তির প্রতি কামনায়ুক্ত হওয়া উচিত; কারণ উহাই কামনা-রোগের মহৌষধ।”

অলক বার বার মাতৃশাসন পাঠ করিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, মোক্ষ কামনাই কল্যাণ লাভের একমাত্র উপায়, এবং সংসঙ্গই সেই মুমুক্ষু সংসাধনের উপায়। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি মহাভাগ মুনিবর দত্তাত্রেয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বিষয়াসক্তি জনিত দুঃখ হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। ভগবান দত্তাত্রেয় অলকের দুঃখের সঠিক কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। দত্তাত্রেয়ের প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়া মাত্রই অলকের চিত্তে বিবেক-বিচারের উদয় হইল। ইহা হইতে মনে হয় যে, অলক বাল্যকালে জননী মদালসার নিকট যে কিছু উপদেশ পাইয়াছিলেন, উহা অল্প হইলেও উহার সংস্কার তাঁহার চিত্ত হইতে তখনও লুপ্ত হয় নাই। মহানুভাব দত্তাত্রেয়ের প্রশ্নে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই সংস্কার পুনরুজ্জীবিত হইল। তিনি দুঃখের উৎপত্তি কোথায় এবং আত্মা কি বস্তু, এই বিষয়ে ভাবিতে লাগিলেন। উদারমুখী অলক পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

“আমি ভূমি নহি, জল নহি, অগ্নি নহি, বায়ু নহি, আকাশ নহি। ... শরীরের সুখ-দুঃখে আমার কি ক্ষতি? আমি শরীর নহি, শরীর হইতে স্বতন্ত্র। আমার ক্ষতি-বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। ... সুখ-দুঃখের স্থান মনে, উহা মনের ধর্ম। ... আমি অহংকার, মন, বুদ্ধি নহি। অতএব অন্তঃকরণে উৎপন্ন দুঃখসহ আমার কোন সম্বন্ধ নাই। ... এই শরীরের অগ্রজই (সুবাহু) রাজ্য চাহিতেছেন। শরীর পাঞ্চভৌতিক, তাহার গুণপ্রবৃত্তির সহিত আমার কি সম্বন্ধ? ... আমার শত্রু নাই, সুখ-দুঃখ, গৃহ, কোষ, হস্তি-অশ্ব, সৈন্য কিছুই নাই। যেমন আমার নাই, সেইরূপ আমার অগ্রজের বা অন্য কোন পুরুষেরও নাই। যেমন আকাশ এক হইয়াও ঘট, শরাবাদ ভেদে নানারূপ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মা এক হইয়াও সুবাহু, কাশীরাজ ও আমি ইত্যাদি দেহ ভেদে নানারূপে দৃষ্ট হইতেছেন।”

(৪)

অলক মহাত্মা দত্তাত্রেয়কে প্রণাম পূর্বক কহিলেন,—
‘ভগবন, আপনার কৃপায় আমার সম্যক দৃষ্টির উদয় হইল। আমার আর কোন দুঃখ নাই।’ দত্তাত্রেয় বলিলেন,—‘আমার একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা মাত্রই তোমার তত্ত্বদৃষ্টি খুলিয়া গেল এবং মমতাবুদ্ধি তুলার ঞ্চায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া গেল। ... যাহারা সংসঙ্গ দ্বারা শাণিত বিচাররূপ কুঠার হস্তে মমতা-বৃক্ষ ছেদন করিতে পারে, তাহারাই ব্রহ্মবনে প্রবেশ করিতে পারে।

ব্রহ্মবন বড়ই শীতল, রজোবিহীন ও নিষ্কটক। ঐ বনে প্রবেশ করিতে পারিলে বৃত্তিশূন্য হইয়া পরম প্রজ্ঞা ও পরমানন্দ লাভ হয়। তৎপর অলক যোগ-সাধন বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলে ভগবান্ দত্তাত্রেয় তাঁহাকে সবিস্তার যোগোপদেশ প্রদান করিলেন। নরপতি অলক বিনম্রচিত্তে দত্তাত্রেয়কে প্রশংসা করিয়া হর্ষভরে বলিতে লাগিলেন—

‘হে ব্রহ্মন, সৌভাগ্যবশেই আমার শত্রুহস্তে পরাভব, যাহার ফলে আপনার সঙ্গলাভ করিতে পারিয়াছি। সৌভাগ্যবশেই কাশীরাজ পরাক্রান্ত, সৌভাগ্যবশেই আমি ক্ষীণবল, সৌভাগ্যবশেই আমার সৈন্যবল নষ্ট, সৌভাগ্যবশেই আমার কোষক্ষয় ও ভয়সঞ্চার হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশেই আপনার পাদপদ্ম আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশেই আপনার উপদেশ লাভ ও আমার জ্ঞানোদয় হইল। সৌভাগ্যবশেই আমার উপর আপনার কৃপা হইল। পুণ্যোদয়ে অনর্থও অর্থরূপে পরিণত হয়। রাজ্য-সংক্রান্ত আমার ভয়ানক বিপদও আপনার সহিত আমার মিলন সাধন করাইয়া পরম হিতকারী হইল। আর সুবাহু ও কাশীরাজ আমার পরম হিতকারী। যাহাতে আর আমার সংসার-দুঃখ প্রাপ্তি না হয়, এক্ষণে আমি তাহাই করিব। আপনার অনুমতি হইলেই আমি গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করি।’

দত্তাত্রেয় অলককে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন এবং উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বলিলেন। অলক ফিরিয়া

আসিয়াই দ্রুতপদে সুবাহু ও কাশীরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে কাশীপতিকে বলিলেন—
‘আপনি রাজ্যার্থী হইয়া আসিয়াছেন। আমার এই সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য আপনাকে দিতেছি, আপনি নিজে ইহা ভোগ করুন বা সুবাহুকে দান করুন বা যাহা ইচ্ছা হয় করুন।’

কাশীরাজ।—অলক, তুমি যাহা করিতেছ—ইহা ক্ষাত্র ধর্ম নহে, শত্রুসহ যুদ্ধ করাই ক্ষাত্র ধর্ম।

অলক।—আমার পূর্বে ঐরূপ ধারণা ছিল। এক্ষণ আমার চিত্তে উহার বিপরীত ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। একমাত্র চিহ্নজ্ঞিরূপী ব্রহ্মই সত্য, অন্য সমস্তই মিথ্যা—দত্তাত্রেয় প্রাসাদে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। এক্ষণ আমি সর্বসঙ্গশূন্য হইয়া চিত্তকে পরমব্রহ্মে নিবিষ্ট করিব। ব্রহ্মজয় করিতে পারিলে বিশ্বজয় হয়। ... হে রাজন, আমিও তোমার শত্রু নহি, তুমিও আমার শত্রু নহ, এই সুবাহুও আমার কোন অনিষ্ট করেন নাই। আমি এক্ষণ ইহা বিশেষরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি। অতএব তুমি এক্ষণ অন্য শত্রুর অনুসন্ধান কর।

অলকের কথা শুনিয়া সুবাহু কাশীশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—‘মহারাজ, যে জন্ম আপনার শরণ গ্রহণ করিয়া-
ছিলাম, আজ তাহা সফল হইল। এক্ষণ আমি প্রস্থান করি।
আপনি সুখী হউন—

যদর্থং নৃপশাৰ্দূল স্বামহং শরণং গতঃ ।

তন্ময়া সকলং প্রাপ্তং যাস্ত্যামি ত্বং সুখী ভব ॥'

কাশীপতি ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিতচিত্তে সুবাহুকে বলিলেন—‘সুবাহো, আপনি কি জন্ম আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোন্ উদ্দেশ্যই বা আপনার সফল হইল? আপনিই ত আমাকে আপনার পিতৃরাজ্য সুবাহুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া দিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। এক্ষণ ত রাজ্য পাইলেন, ভোগ করুন।’

সুবাহু।—কাশীপতি, আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা তত্ত্বজ্ঞান ভুলিয়া সংসারমুখে মত্ত হইয়াছিলেন। আমার জননী অগ্রজ বিক্রান্তকে, অন্নুজ শক্রমর্দনকে এবং আমাকে শৈশবে যেমন মুখে স্তম্ভ দান করিতেন, তেমনি কর্ণে তত্বোপদেশ দান করিতেন, সর্বকনিষ্ঠ অলকের সেইরূপ পূর্ণ সুযোগ লাভ হয় নাই। সঙ্গী পথিকদের একজনের দুঃখ হইলে সকলেরই দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়। আমাদের সেই দশা। কারণ অলকসহ আমাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে। দেহ-সম্পর্কে অলকে আমাদের ভ্রাতৃকল্পনা আছে। ইনি সংসার-মোহজালে আবদ্ধ হইয়া অবসাদ প্রাপ্ত হইতেছিলেন। কোন উপায়ে ইহার চিত্তে দুঃখ জন্মাইতে পারিলে বৈরাগ্যোদয় হইবে, এইজন্য আপনার শরণ লইয়াছিলাম। এক্ষণ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। আমি যাই, আপনার মঙ্গল হউক। যাহারা মদালসার গর্ভে স্থান পাইয়াছে ও তাঁহার স্তম্ভপান করিয়াছে,

তাহাদের পক্ষে অত্র নারীগর্ভসম্ভূত সন্তানদের অনুমত পথে গমন অসম্ভব—

উষ্ট্র। মদালসাগর্ভে পীড়া তস্মাতথা স্তনং ।

নাত্তনারী স্তুতৈর্যাতং বত্স যাত্তিতি পার্থিব ॥

কাশীরাজ ।—সুবাহো, আপনি সাধুমতি অলর্কের পরম হিতসাধন করিলেন। এক্ষণ আমার কিছু উপকার করিবেন না কি ? সাধুসহ মিলন কখনও বিফল হয় না।

সুবাহু ।—পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে আপনার ধর্ম, অর্থ ও কাম সিদ্ধ হইয়াছে, মোক্ষ মাত্রের অভাব আছে। অতএব আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিয়া আপনার যাহা ভাল বোধ হয় করিবেন। ‘আমি’ ‘আমার’—এই বুদ্ধি সমস্ত অনিষ্টের মূল। এই বুদ্ধির বশবর্তী হইবেন না। ধর্মের সর্বদিক বিচার করিবেন। ধর্মের অভাবেই লোক নিরাশ্রয় হয়। জ্ঞেয় কি, জ্ঞাতা কে ? আমিই বা কে ?—এই সকল বিষয় রাত্রির শেষভাগে আলোচনা করিবেন। বিচার দ্বারা জ্ঞানোদয় হইবে। দেহাদি অনানু্যবস্থিতে আত্মবুদ্ধি, এবং যাহা নিজের নহে, তাহাকে নিজের বলিয়া মনে করা মূঢ়তা মাত্র।

সুবাহু চলিয়া গেলেন। কাশীপতিও অলর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নিজ রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। অলর্ক স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ-সিংহাসনে স্থাপন করিয়া বনে গমন করিলেন। তীব্র সাধন ফলে তিনি অতুল যোগসম্পত্তির অধিকারী হইয়া মোক্ষপদ লাভ পূর্বক কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন।

অলর্ক মোহ-মাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এই মর্মে একটি গাথা গান করিয়াছিলেন—

‘আমি প্রথমে রাজ্যভোগ করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম যোগ অপেক্ষা অধিকতর সুখময় বস্তু আর কিছুই নাই।’

মদালসা যে সকল তত্ত্বকথা তাঁহার পুত্রদিগকে শুনাইয়া তাঁহাদের জীবনে বর্ণিত প্রকার পরিণতি আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণ শ্লোকবদ্ধ হইয়া বেদান্ততত্ত্বজিজ্ঞাসুর, বিশেষতঃ ব্রহ্মাষ্টেবী সন্ন্যাসীদের স্বাধ্যায় মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে—
বেদান্ত স্তোত্রাবলী মধ্যে মদালসা-বাণী অন্যতম। শ্লোকগুলি এই—

শুদ্ধোহসি বুদ্ধোহসি নিরঞ্জনোহসি

সংসার মায়া পরিবর্জিতোহসি ।

সংসার স্বপ্নং ত্যজ মোহ নিদ্রাং

মদালসোল্লাপমুবাচ পুত্রম্ ॥১

মদালসা স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতেছেন—হে পুত্র ! তুমি শুদ্ধ, তুমি চৈতন্যস্বরূপ, তুমি নিরঞ্জন, তুমি সংসার-মায়া শূন্য, সংসারস্বপ্নজনক মোহনিদ্রা ত্যাগ কর ।

শুদ্ধোহসি রে তাত ন তেহস্তু নাম

কৃতং হি তৎ কল্পনয়াধুর্নৈব ।

পঞ্চাভ্যকং দেহমিদং ন তেহস্তু

নৈবাস্ত্য হ্রং রোদিষি কস্ম্য হেতোঃ ॥ ২

হে পুত্র তুমি শুদ্ধ, (সর্বোপাধি বিবর্জিত), তোমার কোন নাম নাই, অধুনা কল্পনা করিয়া তোমার একটা নাম রাখা হইয়াছে। পাঞ্চভৌতিক এই শরীর তোমার নয়, তুমিও শরীরের কেহ নহ, তবে কেন তুমি রোদন করিতেছ ?

ন বা ভবান্ রোদিতি বৈশ্বজন্ম

শব্দোহরমাসাত্ত মহীশসু নুম্।

বিকল্পমানো বিবিটধণ্ডণাটর্ধঃ

গুণাশ্চ ভৌতাঃ সকলেন্দ্রিয়েষু ॥৩

তুমি বিভিন্ন গুণ সহযোগে নিজেকে সুখী বা দুঃখী মনে করিতেছ। কিন্তু ঐ সকল গুণ ভৌতিক এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা উহাদের ভোগ হয়। তুমি আত্মস্বরূপ, সুতরাং বাস্তব পক্ষে তুমি রোদনও করিতেছ না। ঐ রোদনধ্বনি রাজকুমারকে আশ্রয় করিয়া বাহির হইতেছে।

ভূতানি ভূটতঃ পরিতুর্দলানি

বুদ্ধিং সমাযান্তি যথেষ্ট পুংসঃ।

অন্নান্নুপানাদিভিরেব তস্মাৎ।

ন তেহস্তি বুদ্ধির্নচ তেহস্তি হানিঃ ॥৪

যেমন ভূত দ্বারা ভূত বুদ্ধি বা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুরুষ (দেহ) অন্নজলাদি ভোজনপান দ্বারা বুদ্ধি ও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তজ্জন্ম তোমার কিছুই বুদ্ধি বা হানি হয় না।

ত্বং কণ্ঠকে শীর্ষ্যমাণে নিজেহস্মিন্

তস্মিন্ দেহে মূঢ়তাং মা ভজেথাঃ ।

শুভাশুভৈঃ কৰ্ম্মভির্দেহমেতন্-

মুদাদিভিঃ কণ্ঠকস্তেপিনদ্ধঃ ॥৫

অস্থিমাংসময় এই দেহ পুণ্যপাপরূপ কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন
এবং মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি ভূত দ্বারা ব্যাপ্ত । এই নাশশীল
কণ্ঠক (জামা, সাপের খোলস) রূপ দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া
মূঢ়তা প্রাপ্ত হইও না ।

তাতেতি কিঞ্চিৎকনয়েতি কিঞ্চি-

দশ্বেতি কিঞ্চিদ্রস্মিতেতি কিঞ্চিৎ ১ ।

মমেতি কিঞ্চিন্মমেতি কিঞ্চি-

ত্বং ভূতসংঘং বহুমানয়েথা ॥৬

কেহ আমার পিতা, কেহ পুত্র, কেহ মাতা, কেহ স্ত্রী,
এটা আমার, এটা আমার নয়—এইরূপ তুমি মনে নিশ্চয়
করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু ইহাদিগকে বহু মাননা করিও না, কারণ
এ সকলই পাক্‌ভৌতিক ।

সুখানি দুঃখোপশমায় ভোগান্ ।

সুখায় জানাতি বিমূঢ়চেতাঃ ।

তাৎশ্বে দুঃখানি পুনঃ সুখানি

জানাতি বিদ্বানবিমূঢ়চেতাঃ ॥৭

মুচ্যিত্ত ব্যক্তি বিষয়জাত সুখ হইতে দুঃখের নিবৃত্তি হয়
ভাবিয়া ভোগকে সুখস্বরূপ মনে করে। কিন্তু জ্ঞানী পুরুষ
বিষয় সঞ্জাত দুঃখকে সুখের অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া
মনে করেন।

হাসৌহস্থি সন্দর্শনমক্ষিযুগ্মা-

মভ্যুজ্জ্বলং তৎ কলুষং বসায়ঃ ।

কুচাদি পীনং পিশিতং ঘনং তৎ

স্থানং রতেঃ, কিং নরকো ন যোষিৎ ॥ ৮

রমণী হাস্য করিলে অস্থি দেখা যায়, তদীয় মনোরম
নেত্রদ্বয়ও বসাদ্বারা কলুষিত, পীনস্তন কতকগুলি মাংসের
সমষ্টি মাত্র। জীদেহ কি নরকতুল্য নয় ?

জীদেহের নিন্দার উদ্দেশ্য দৈহিক ভোগাসক্ত লোকের চিন্তে
বৈরাগ্য উৎপাদন, জীজাতির নিন্দা করা অভিপ্রায় নহে। শঙ্করা-
চার্য্যের 'দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী' বলার উদ্দেশ্যও তাহাই।
শ্রীচণ্ডীতে শ্রীশ্রীজগন্মাতার স্তোত্রে আছে,—‘স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ
সকলা জগৎসু’—জগতে গুণাবিতা যাবতীয় জী স্ময়ং নারী-মূর্তি
শ্রীদেবীর অংশ। বর্তমান পুস্তকে বর্ণিত মদালসার ত্রায়
লোকতিল্লকোপমা নারীগণের চরিত্র ইহার দৃষ্টান্ত। নারী নরক-
তুল্য নহে, কামাসক্তিই নরকতুল্য—নর নারী উভয় পক্ষেই।

যানং ক্ষিতৌ যানগতশ্চ দেহেহা

দেহেহপি চান্যঃ পুরুষো নিবিষ্টঃ ।

মমত্বমূৰ্ছ্যাং ন যথা তথাস্মিন্
দেহেতি মাত্রং বত মূঢ়ত্বা ॥ ৯

যান (গাড়ী ইত্যাদি) পৃথিবীতে স্থিত, যান মধ্যে শরীর স্থিত, শরীর মধ্যে পুরুষ (জীব) স্থিত। যেমন কেহ পৃথিবীকে বা যানাদিকে আপন শরীর বলিয়া মনে করে না, সেইরূপ এই শরীরেও আত্মবাক্য করা অনুচিত, করিলে তদপেক্ষা মূঢ়তা আর কি হইতে পারে ?

তত্ত্বাষ্মেষীর পাঠ্য রূপে নিদিষ্ট হওয়ায় এই সকল উপদেশের জন্য প্রত্যেক ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মদালসার নিকট ঋণী। ইহার সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ এই যে একমাত্র আত্মাই সত্য, আর সব অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, মিথ্যা, এবং আত্মজ্ঞানই অর্থাৎ নিজেকে আত্মস্বরূপে জানাই মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা, সুতরাং চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। নতুবা পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণরূপ দুঃখ অনিবার্য।

মদালসার চরিত্রে যে কয়েকটি বিষয় বিশেষরূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা এই—

১। মদালসার শিক্ষায় তাঁহার পুত্রগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উচ্চশিখরে আরোহণ করিলেও, এবং গৃহবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, সুবাহুর কার্য্যই তাহার প্রমাণ। মদালসার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা সাধারণ সাংসারিক জীবনের মত হইতে পারেন না—সুবাহুর এই কথায় তাঁহারা মাতার গৌরবে

মদালসা

৩৫

কতদূর গৌরবান্বিত, তাহা বুঝা যায়, আবার সুবাহুঁ যে অমূল্য বস্তু পাইয়াছেন, তাহা ভাইকে দিবার জ্ঞাত্ত তাঁহার যে কি গভীর আগ্রহ, তাহাও বুঝা যায়। ঐ আগ্রহ সফল করিবার জ্ঞাত্ত সুবাহু কাশীরাজকে দিয়া পৈতৃক রাজ্য আক্রমণ করাইয়া অলর্ককে মোহমুক্ত করতঃ রাজপ্রাসাদ হইতে বনবাসে আনিয়া-
ছিলেন—ইহাও এক অশ্রুতপূর্ব্ব ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্ত। মা পুত্রদিগকে সন্ন্যাসী করিতেছেন, ভাই ভাইকে সন্ন্যাসী করিতেছেন! আপাত-দৃষ্টিতে এই ব্যাপার নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হয়। অনেক, বিশেষতঃ মায়েরা প্রায় সকলেই হয়ত বলিবেন—‘নিজের ছেলেগুলিকে সন্ন্যাসী করিয়া কি ভাল কাজটা মদালসা করিলেন, আর নিজের ভাইকে রাজ্যভ্রষ্ট সন্ন্যাসী করিয়া সুবাহুই বা কি ভাল কাযটা করিলেন? এমন কার্য্য কি কোন মা ভাই সুস্থ মনে, সুস্থ দেহে করিতে পারে? বিকৃতমস্তিষ্ক পাগলেও বোধ হয় করে না!’ কিন্তু বিষয়টা একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে ইহার মধ্যে মদালসার কি গভীর সন্তানস্নেহ ও সুবাহুর কি গভীর ভ্রাতৃবৎসলতা বর্ত্তমান। আসল কথা হইতেছে লোকের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া। একজন অধ্যাত্ম-তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাত্মা সংসারকে যে দৃষ্টিতে দেখেন, অজ্ঞানীর দৃষ্টি তাহা হইতে ভিন্ন। জ্ঞানী দেখেন সংসার স্বপ্নবৎ মিথ্যা, অসার, তুচ্ছ দ্রুংখময় এবং ব্রহ্মে স্থিতিলাভই সারাৎসার,। অজ্ঞানীর চক্ষে সংসার মিথ্যা নহে, অসারও নহে, এবং ব্রহ্মে স্থিতি একটা

খেয়াল মাত্র। সংসারে যে একেবারেই কোন সুখ নাই, উপাদেয় বস্তু নাই একথা জ্ঞানী বলেন না। কিন্তু সংসারে দুঃখশূন্য সুখ নাই, সেইজন্য ব্রহ্মানন্দের তুলনায় অতি বড় সাংসারিক সুখও অকিঞ্চিৎকর, অনুপাদেয় ও অগ্রাহ্য—ইহা জ্ঞানীর অনুভূত সত্য, ইহা ঋষিদের কথা এবং ইহাই শ্রুতি-সিদ্ধান্ত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দবল্লীর আনন্দ-মীমাংসায় দেখিতে পাই সমগ্র পৃথিবীর সম্রাটের, এমন কি ব্রহ্মাও-নায়ক প্রজাপতিদেবের যে সুখ, তাহাও ব্রহ্মানন্দের এক কণিকার সহিত তুলনীয় নহে। এই ব্রহ্মানন্দের আশ্বাদ পাইয়াছিলেন মদালসা ও সুবাহু। যাহা যাহার নিকট সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সে তাহা তাহার প্রাণাধিক প্রিয়জনকে দিতে চায়। মদালসা যে আনন্দময় বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তুচ্ছ সংসার ভোগের অনুরোধে প্রাণাধিক পুত্রদিগকে না দিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। সুবাহু যে আনন্দময় বস্তু ভোগ করিতেছিলেন, তাহা তিনি প্রাণাধিক ভাই অলর্ককে না দিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা পুত্রকে ভাইকে তুচ্ছ দৈহিক রাজপদ হইতে মুক্ত করিয়া চিদানন্দ সুখধাম আশ্রয়প্রতিষ্ঠায়, স্বরাজ্য-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব একমাত্র পুত্রকে ও স্ত্রীকে ভিক্ষু ভিক্ষুণী করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া আনিলেন। রাজপ্রাসাদের সুখ হইতে অধিকতর কোন সুখের বস্তু তিনি নিজে না পাইলে কখনই স্ত্রী-পুত্রকে সন্ন্যাসী করিতেন না। সেইজন্য এই

মদালসা চরিত্রেই ভগবান দত্তাত্রেয়ের কৃপায় লব্ধজ্ঞান অলঙ্কর মুখে শুনিলাম—সৌভাগ্যবশেই কাশীরাজ আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যবশেই আজ আমি মাতার শাসনলিপি হইতে গুরুকৃপায় বৈরাগ্যের আনন্দ লাভ করিলাম। ইহা স্মরণ করাইয়া দেয় তুর্য়ানাদে ঘোষিত শঙ্করাচার্যের সেই বাণী—‘নিজ গৃহাৎ তূর্বং বিনির্গম্যতাম্’—ত্বরায় নিজ গৃহ হইতে বাহির হও। কেন? কারণ

কৌপীনবস্ত্রঃ খলু ভাগ্যবস্ত্রঃ—যে কৌপীন ধারণ করিয়াছে সেই বৈরাগ্যবানই ভাগ্যবান।

২। মদালসার বিদ্বত্তা একটি লক্ষ্য করিবার বস্তু। সেই প্রাচীন ভারতে ভদ্র গৃহের রমণীরা, এখন কি ভোগবিলাসপূর্ণ রাজগৃহের রমণীরাও কিরূপ বিদ্বাবতী হইতেন মদালসার দৃষ্টান্ত হইতে ইহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মদালসা তাঁহার পুত্রকে যে সকল জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাহা রক্ষিত করিয়া পুরাণকার আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায়, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি ধর্মনীতি সর্ব বিষয়ে মদালসার বিদ্যা, অভিজ্ঞতা, সুক্ষ্ম-দৃষ্টি সুদূর প্রসারিণী ছিল। রাজকুমারদের শিক্ষার ভার কতক পিতা স্বয়ং গ্রহণ করেন, কতক বা সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের উপর অর্পণ করেন। প্রায় সর্বত্রই এইরূপ দৃষ্ট হয়,—প্রাচীনকালেও এই রীতি ছিল। যে দেশে নারীরা এক সময়ে সুশিক্ষিতা ছিলেন,

সেই দেশে যে রাজা ঋতধ্বজের রাজ্যে বা সভায় সুশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু মহারাজ ঋতধ্বজ অলর্কের শিক্ষার জন্য অন্য কাহাকেও নিযুক্ত না করিয়া মদালসার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন। এতদ্বারা মদালসার পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা সম্বন্ধে যে রাজার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। রাজনীতি, রাজ্য শাসন, শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা সম্বন্ধে মদালসা পুত্রকে যে সকল শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে বাল্মীকি-বর্ণিত ভারতের প্রতি কীরামচন্দ্রের উপদেশাবলী মনে পড়ে। এই ত হইল অপরা-বিদ্যা সম্বন্ধে, আর পরাবিদ্যায় যে তিনি কিরূপ পরিনিষাগত ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রথম তিন পুত্রকে প্রদত্ত উপদেশ হইতে সম্যক্ উপলব্ধ হয়।

৩। মদালসার অপূর্ব পতি-পরায়ণতা আর একটি লক্ষ্য করিবার বস্তু। অসাধারণ জ্ঞান ও বিদ্যার অধিকারিণী মদালসা যে পতিপ্রেমসর্বস্বা ছিলেন, প্রথম জীবনে ঋতধ্বজের নিধন বার্তা শুনিবামাত্র তাহার দেহত্যাগের কাহিনী ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিতেছে। মহীয়সী মদালসার চরিত্র জ্যোতিঃ এই দিক্‌টা আরও উজ্জ্বল করিয়াছে। আজন্ম ব্রহ্মবিদুষী মদালসা তাঁহার প্রাণের বস্তু ব্রহ্মবিদ্যা প্রিয়পুত্র বিক্রান্ত, সুবাহু ও শত্রুজিৎকে দান করিয়াছিলেন। ফলে তিন পুত্রই সংসার বিরাগী হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র অলর্কেও যখন তিনি তাঁহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,

তখন রাজা স্বতন্ত্র ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত হৈতু দেখাইয়া তাহাতে আপত্তি করিলেন। পতির অভিপ্রায় জ্ঞাত হইবা মাত্র মদালসা দ্বিরুক্তি না করিয়া, পতিসহ তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া, নিজের বিদ্যাভিমান প্রদর্শন না করিয়া পতির আজ্ঞা পালনে প্রযত্নপরা হইলেন। যে মদালসা তত্ত্বজ্ঞান দিয়া পুত্রদিগকে সন্ন্যাসী করিতে কুষ্ঠিতা বা ব্যথিতা নহেন, সেই মদালসা পতির ইচ্ছায় অকুষ্ঠিত চিত্তে নিজের অভীষ্ট পথ ত্যাগ করিলেন। তিনি অলর্ককে রাষ্ট্রবিদ্যা ও ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। অলর্ক রাজা হইলেন। কিন্তু মদালসা যেন দিব্য-দৃষ্টিতে অলর্কের ভবিষ্যৎ বিপদ চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছিলেন। অবশ্য এই বিপদের মূলেও তিনি, কারণ তাঁহারই পুত্র, শিষ্য, উপদিষ্ট সুবাহু অলর্ককে বৈরাগ্য-পথে আনিবার জন্ত ঐ বিপদের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। বিপদ ঘটিলে সত্বপায় অবলম্বনের জন্ত তিনি পুত্রের জন্ত যে অঙ্গুরীয়কবন্ধ শাসনপত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন, উহাই অলর্ককে শেষে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে লইয়া আসিল। মদালসা যেন এই সমস্ত ব্যাপার পূর্বেই জানিতেন। তথাপি তিনি পতির আদেশ লঙ্ঘন না করিয়া অলর্ককে রাজোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন।

৪। মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষার অব্যর্থতা মদালসা চরিত্রে আর একটা লক্ষ্য করিবার বস্তু। মদালসা সর্বোচ্চ বেদান্ত-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন ক্রোড়স্থ শিশুকে। সন্ন্যাসী রাজপুত্র সুবাহু

বলিয়াছেন, 'মাতা যখন তাহাদের মুখে স্তন দান করিতেন, সেই সময়ে আবার কর্ণে ব্রহ্ম-জ্ঞানও প্রদান করিতেন। কিন্তু একটি স্তন্যপায়ী শিশুর বেদান্তের উপদেশ গ্রহণ করা, ধারণ করা ত দূরের কথা, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করাও কি সম্ভব? এস্থলে দেখিতেছি, সেই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। অর্থাৎ মাতৃশক্তি, মাতার ভাবপ্রভাব অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। 'আশ্চর্য্য বক্তা কুশলোহস্ত শ্রোতা' একথা আমরা উপনিষদে দেখিয়াছি। ব্রহ্মবিদ্যুদী মদালসার ন্যায় বক্তা যে 'আশ্চর্য্য' অর্থাৎ অতীব সুদূর্লভ তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু 'শ্রোতাও কুশল'—একথা কি একটি স্তন্যপায়ী শিশু সম্বন্ধে খাটে? উপনিষদও কোন শিশুকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলেন নাই। উপনিষদ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন বিচারবিবেকবান ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে 'কুশল শ্রোতা' আখ্যা দিয়াছেন। ঐরূপ শ্রোতা দূর্লভ—ইহাই উপনিষদের বক্তব্য। "গুরোস্ত মোনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্ত ছিন্নসংশয়াঃ"—গুরু কিছুই বলিতেছেন না, অথচ তাঁহার ভাব শিষ্যচিন্তে প্রবিষ্ট হইয়া সংশয় নাশ করিতেছে এস্থলেও 'বৃদ্ধাঃ শিষ্যাঃ', শিষ্যেরা সাধনসম্পন্ন বয়ঃস্থ পুরুষ। কিন্তু মদালসা চরিত্রে দেখিতেছি তাঁহার ক্রোড়স্থ একটি শিশু কুশল শ্রোতা হইয়াছে। এই অসম্ভব সম্ভব হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে মাতৃদত্ত উপদেশের মধ্যে। কুন্তকারের হস্তে একটি বর্দ্ধমপিণ্ড যেমন তাহার যথেষ্ট আকারে আকারিত হইতে পারে, মাতার উপদেশে সেইরূপ শিশু-চরিত্র তাঁহার

ইচ্ছানুসারে গঠিত হইতে পারে। ইহা সাধারণতঃ ব্যবহারিক বিষয় সম্বন্ধে সত্য। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আরও কিছু প্রয়োজনীয় আছে। কারণ ইহা সকলে দিতে পারে না, সকলে গ্রহণ করিতেও পারে না—উপনিষদ ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। মদালসার ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার জন্মান্তরীণ সাধন-সিদ্ধিজাত জীবনগত বস্তু। তিনি কি কেবল কতকগুলি বাক্য উচ্চারণ করিয়া শিশুকে শিক্ষা দিতেন? কখনই নয়। ইহা কেবল বাক্যের প্রভাব নহে, কিন্তু তৎসহ জীবন্ত ভাবের প্রভাব। ব্রহ্মবাদিনী মদালসা তাঁহার স্তম্ভধারার সঙ্গে সঙ্গে দিতেছেন তাঁহার জীবন্ত ব্রহ্মানুভূতির ভাবামৃতধারা যাহা শিশুর অস্থিমজ্জায়, শিরায় শিরায় দেহ-মন বুদ্ধির অণু-পরমাণুতে প্রবেশ করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, যাহার অব্যর্থ ফল হইল বালকত্রয়ের যৌবন প্রারম্ভেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ। এইরূপে শিক্ষা দেওয়া কেবল মাতার পক্ষেই সহজসাধ্য। মদালসা বালকদের কেবল ব্রহ্মবিদ্যুদী গুরুই ছিলেন না, কিন্তু অধিকন্তু তিনি ছিলেন মাতা। স্তম্ভধারার সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের ভাবধারা যাতা ভিন্ন আর কে দিতে পারে? মাতৃদত্ত শিক্ষার যে একটা অমোঘ শক্তিশালিতা আছে, তাহার দৃষ্টান্ত মদালসা চরিত্রে পাইলাম।

আমরা যে অধুনা সমাজে, রাষ্ট্রে, নীতিতে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে এত অবনত হইয়াছি, তাহার কারণ আর মদালসার মত মাতা নাই, কাজেই সুবাহু, অলক্কেঁর মত পুত্রও নাই। আমার

পূজ্যপাদ গুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ রামানন্দ স্বামীজি আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল পূর্বে রচিত তাঁহার ‘অলর্ক চরিত’ নামক পুস্তিকায় (ইং ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত) বলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা এক্ষণে মাতৃহীন জাতি ! তিনি লিখিয়াছেন—

“পুরাতন ভারত কি ছিল, সেই সময়ে জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম কি ছিল, তাহার আলোচনা করিতে হইলে মহাত্মা অলর্কের চরিত একটা উপকরণ। যখন যে দেশ উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করে, তখন সেই দেশের উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই বিদ্যা শিক্ষায় নিপুণ হইয়া থাকেন, এবং এইরূপ শিক্ষিত পিতামাতা হইতেই প্রধান প্রধান লোকের জন্ম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শিক্ষিতা ও নীতি-ধর্মপরায়ণা মাতার সন্তান কখনই সমাজ-বন্টক হইতে পারে না। এই জগুই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন দেশকে উন্নত করিতে হইলে শিক্ষিতা ও নীতিধর্মপরায়ণা মাতার প্রয়োজন। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে তাঁহার একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— ‘ফ্রান্সকে উন্নত করিতে হইলে কি কি উপকরণ আবশ্যক?’ ইহার উত্তরে নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন—‘কয়েকজন শিক্ষিতা মাতা হইলেই ফ্রান্স সমুন্নত হইতে পারে।’ বাস্তবিক আমরাও তাহাই স্বীকার করি। যদি থিয়োডর্ পার্কারের জননী শিক্ষিতা ও ধর্ম-পরায়ণা না হইতেন, তাহা হইলে পার্কারের গ্রাম একজন ! পুরুষরত্ন পাইয়া আমেরিকা গৌরব করিতে পারিত না। আর

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মাতা যদি সেইরূপ শিক্ষিতা ও তেজস্বিনী না হইতেন, তবে ফ্রান্সের গর্ব কোথায় থাকিত? পাঠক, তুমি জিজ্ঞাসা করিবে—‘আমেরিকা ও ফ্রান্সের উন্নতিতে তোমার আমার কি? আমরা ত বাঙ্গালী বই আর কিছুই নই।’ নব্য ভারতীয়ের মুখ হইতে এই কথা বাহির হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ মাতৃহীন জাতি আর অধিক কি বলিতে পারে? কিন্তু পুরাতন ভারতের কিছু বলিবার আছে। পুরাতন ভারত বলিবে—‘এক সময়ে ভারতে মাতা ছিল, এবং তদনুরূপ সন্তানও ছিল।’

বর্তমান সময়ে নারী-শিক্ষা ও নারী-প্রগতি যে খাতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে প্রকৃতই আমরা মাতৃহীন হইতে বসিয়াছি কিনা তাহা বিবেচ্য। কারণ মদালসার মত মা আর পাইব কিনা কে জানে? পুঁথিগত বিদ্যার নিন্দা উদ্দেশ্য নহে। মদালসারও পুঁথিগত বিদ্যা কম ছিল না। কিন্তু কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে। এতৎসহ চাই মদালসার সমুন্নত নীতিনিষ্ঠা, চারিত্রিক উৎকর্ষ, সদাচার, পাতিব্রত্য মাহাত্ম্য উচ্চ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। এই সকল গুণ আমাদের পূর্বতন ‘মা’-দিগের মধ্যে—তঁাহারা পুঁথিগত বিদ্যায় তেমন পারদর্শিনী না হইলেও—প্রচুর পরিমাণে ছিল, যাহার ফলে এই পরপরাজিত অবনত জাতির মধ্যে এ যুগেও অনেক লোকপাবন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে শিক্ষিতাদের মধ্যে ঐ সকল গুণের অভাব

হইতেছে কিনা, পূর্বযুগের উন্নত নীতি-ধর্মের আদর্শ ক্রমেই
অদৃশ্য হইতেছে কিনা, এবং হইয়া থাকিলে এই ক্ষতি পূরণের
জন্য প্রচলিত স্ত্রী-শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার আবশ্যক কিনা ইহা
বিবেচ্য। আমরা আজ প্রকৃতই মাতৃহারা হইতে বসিয়াছি কিনা
প্রত্যেক সমাজ হিতকামীর ইহা এক্ষণ ভাবিবার সময়
আসিয়াছে। ❁

* মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত (২০-৪৫ অধ্যায়) মদালসা চ রত্রে এক-
খানি প্রথম শ্রেণীর নাটকীয় উপকরণ বর্ণিত আছে। নাট্যশিল্পগণের
ইহা অমূল্যসম্পদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্কটী রাক্ষসী

যোগবাশিষ্ঠের উৎপত্তি-প্রকরণে এক ব্রহ্মবিদ্যুযী রাক্ষসীর ইতিহাস আছে। রাক্ষস জাতিতে ব্রহ্মজ্ঞানীর উদ্ভব বিচিত্র বটে। তবে এইরূপ ঘটনা একান্ত তুল্য নহে। বেদের রাবণকৃত টীকা আছে। এই টীকাকার রাবণ যে, রাক্ষসরাজ লঙ্কাধিপতি রাবণ—প্রাচীন বেদজ্ঞ সমাজে ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস। ইহা সত্য হইলে রাবণ যে একজন খুব বড় বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হয়। তবে পণ্ডিত হইলেই ব্রহ্মবেত্তা হওয়া যায় না। বিভীষণ পরম ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। অবশ্য এই সকল দৃষ্টান্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ রাক্ষসগণ জাতীয় প্রকৃতি অনুসারে ক্রুর, নৃশংস, পরপীড়ক, প্রাণিহিংসাপরায়ণ হয়। এই সকল দোষ ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রতিকূল বলিয়াই গণ্য। এই সকল জাতিগত দোষ প্রথমে কর্কটী রাক্ষসীরও ছিল। কিন্তু উগ্র তপশ্চা দ্বারা তাহার জাতীয় প্রকৃতি মার্জিত হইয়া নবতর আকার ধারণ করিয়াছিল। রাক্ষসদেহে জীবনধারণ করিবার জন্য তৎকর্তৃক অবাধ জীবহিংসা তপশ্চান্তে প্রথমতঃ সঙ্কুচিত হইয়া একটী বিশিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়। জীবনের শেষ অঙ্কে কর্কটী জীবহিংসা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিল এবং যেক্রমে সে নিজে হিংসা না করিয়া জীবন

ধারণ করিত। পাঠক তাহা পরে জানিতে পারিবেন। ব্রহ্মজ্ঞানে
রাক্ষসী প্রকৃতিও যে পরিবর্তিত হইয়া যায়, কৰ্কটী-চরিত্র তাহার
একটি দৃষ্টান্তস্থল।

কৰ্কটী রাক্ষসী হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে বাস করিত।
তাহার রূপ ছিল তামসী নিশার ত্রায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মূর্তি ছিল
অতি ভয়ঙ্করী, দেহ অতি বিস্তৃত। রাক্ষসদের বংশ অসংখ্য।
তাহাদের মধ্যে কেহ গুরু, কেহ কৃষ্ণ, কেহ সবুজ, কেহ বা উজ্জল-
বর্ণ। কৃষ্ণবংশে জন্ম বলিয়া কৰ্কটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কৰ্কট
নামক রাক্ষস-পিতার কন্যা বলিয়া উহার নাম হইয়াছিল কৰ্কটী।
কৰ্কটীর হস্ত-পদাদিও কৰ্কটের (কাঁকড়া) ত্রায় লম্বা ছিল।
কৰ্কটীর উদরজ্বালা কিছুতেই নিবৃত্ত হইত না। তাহার দুয়োদর
পূর্ণ হইবার উপযুক্ত পরিমাণ আহাৰ্য্য মিলিত না বলিয়া এক
দিনের জন্তও ক্ষুধা শান্তি হইত না—সে সদাই ক্ষুধার্ত থাকিত।
রাক্ষসী মনে করিল এমন কিছু একটা করা চাই, যাহাতে সে
জন্মুদীপের সমস্ত জীবজন্তুকে এক নিশ্বাসে ও এক গ্রাসে উদরস্থ
করিতে পারে। কিন্তু সকলকেই যে সে খাইতে পারিবে, এইরূপ
আশা করা যুক্তিসিদ্ধ নয়, কারণ অনেকেই হয়ত মন্ত্র, ঔষধ, দান,
পুণ্যকৰ্ম ইত্যাদি দ্বারা সুরক্ষিত আছে। যাহা হউক, সে স্থির
করিল যে তপস্কার অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব তপস্কা দ্বারা
যাহাতে সে সকল জীবকে যুগপৎ গ্রাস করিতে পারে, সেইরূপ
চেষ্টা করিবে। সৰ্ব্বজীব-জিঘাংসায় সে হিমাচলে গমন পূর্বক
ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাকে সহস্রবর্ষব্যাপী ঊষ

তপস্তায় জর্জরিত দেহ দেখিয়া ব্রহ্মা দয়াপরবশ হইলেন এবং বর প্রদানের নিমিত্ত আগমন করিলেন। তপোবলে বিষাগ্নিও শীতল হয়, অতএব রাক্ষসীর ব্রহ্মপ্রসাদ লাভ অসম্ভব নহে। ব্রহ্মাকে সম্মুখে দেখিয়া সে ভাবিল—নিশ্চয়ই ইনি বর দিতে আসিয়াছেন, কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া মনে মনে স্থির করিল যে, এমন একটা বর প্রার্থনা করা যাউক, যাহাতে সে আয়সী (লৌহময়ী) ও অনায়সী (ব্যাধিরূপিণী) সূচী (সূচ, যাহা দ্বারা সেলাই করা হয়) হইতে পারে—তাহা হইলে সূক্ষ্ম বা বস্ত্রমধ্যগত সূচের ত্রায় সকলের অলক্ষ্যে প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্বক তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ক্ষুণ্ণিভূতি করিতে পারিবে। ব্রহ্মা উহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন—শম, দম, দয়া প্রভৃতি তপস্বিগণের ধর্ম, কিন্তু এই রাক্ষসী তাহার বিপরীত লোক-হিংসায় উদ্ভূত হইয়াছে। এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়াও তিনি কর্কটীর তপঃক্লেশে দয়াপরতন্ত্র হইয়া উহাকে বলিলেন—

‘হে পুত্রি, উঠ, আমি তোমার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, ইচ্ছানুরূপ বর গ্রহণ কর। কর্কটী বলিল—‘হে প্রভু, যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বরদান করুন যেন আমি আয়সী ও অনায়সী সূচিকা হই।’ ব্রহ্মা বলিলেন—‘তথাস্তু। তুমি রিসূচিকা (ঐ নামে প্রসিদ্ধ রোগ বিশেষ) হইবে। যাহারা অপরিমিত-ভোজী, কুৎসিতস্থানবাসী, অপবিত্র দ্রব্য-সেবনকারী, দুষ্ক্রিয়ান্বিত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কৰ্ম্মাসক্ত, তাহাদের

ভিতরে অলক্ষিতভাবে প্রবেশ পূর্বক তুমি তাহাদিগকে হিংসা করিবে। কিন্তু আমি যে মন্ত্ৰটী বলিতেছি, সদাচারী ব্যক্তির চিকিৎসার্থ উহার ব্যবহার করিলে তোমার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে।' ভগবান্ ব্রহ্মা মন্ত্ৰটী বলিয়া চলিয়া গেলেন। কৰ্কটী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে সূক্ষ্মতম সূচীর আকার ধারণ করিল— লৌহসূচী ও রোগরূপা জীবসূচী দ্বিবিধ রূপে বিরাজিত হইল। সূচীভাবাপন্ন রাক্ষসী অদৃশ্য হইলেও তাহার অন্তরে বাসনা বর্তমান ছিল। বিশেষতঃ উদর না থাকায় খাইয়াও ভালরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না। সে রুগ্ণব্যক্তির নিশ্বাসে ও মক্ষিকাদি কীটদ্বষ্ট, দুর্গন্ধ বায়ুযুক্ত, শ্রীবৃক্ষ (বিষ ও তুলসী)-বর্জিত, পশু-নরাদির অস্থিসমাচ্ছন্ন, সাধুসজ্জনহীন দেশে, ছারপোকা, মণা প্রভৃতি রক্তপায়ী কীটপূর্ণ স্থানে এবং বহুল নিশ্বাসযুক্ত পান্থশালায় যাতায়াত করিতে লাগিল। এই প্রকারে বিসৃচিকারূপিণী কৰ্কটী বহুকাল বহু জীব বধ করিয়া এবং নরমাংসাদির স্বাদ গ্রহণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিল না। সূক্ষ্ম-দশায় তাহার কিঞ্চিৎ মানসিক তৃপ্তিলাভ হইলেও দৈহিক তৃপ্তি-লাভ হইল না, কারণ দেহধারী জীবই দৈহিক তৃপ্তিলাভের অধিকারী। সুতরাং তাহার বাসনা পূর্ণ হইল না। সে স্থির করিল যে, পূর্বতন দেহ লাভার্থ আবার তপস্যা করিবে। হিমালয়-শৃঙ্গে গিয়া সে মহোগ্র তপস্যায় মগ্ন হইল। তাহার তপস্যার তেজে জগৎ প্রজ্বলিতপ্রায় হইল। সপ্তসহস্র বর্ষ তপস্যার ফলে তাহার জ্ঞানোদয় হইল। তাহার চিত্ত নির্মল

হইল এবং সগুণ-নিগুণব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইল। ব্রহ্মা আবার বর দিতে আসিয়া বলিলেন—“পুত্রি, বর গ্রহণ কর।” বাগিস্থিয় না থাকায় সে কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু সে অপার আনন্দ লাভ করিতেছে, আর কি বর লইবে। ব্রহ্মা আবার বলিলেন—

‘পুত্রি, বর গ্রহণ কর। তুমি এই পৃথিবীতে কিছুদিন ভোগ্য ভোগ কর, তৎপর পরমানন্দ লাভ করিবে। তোমার সংকল্প সফল হউক—তুমি পুনরায় বৃহদায়তন রাক্ষসীদেহ লাভ কর। তুমি এখন আর কোন জীবের ক্লেণ উৎপাদন করিও না। এক্ষণ তুমি সমাধি অবলম্বন করিয়া থাক। যদি কদাচিৎ নিৰ্ব্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যাখিত হও, তাহা হইলে ক্ষুন্নিবৃত্তির জগৎ অশাস্ত্রীয় হিংসা ত্যাগ করিয়া শ্রায়ানুসারে প্রাণিহিংসা করিবে। তুমি স্বয়ং শ্রায়পথে থাকিয়াও জীবমুক্ত হইয়া অন্ত্রাচারীদের হিংসা সাধন করিবে।’

এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্দ্বান হইলেন। কর্কটী পুনরায় অবিকল পূর্ব বৃহৎ রাক্ষসদেহ লাভ করিল। তাহার রাক্ষসদেহ হইল বটে, কিন্তু রাক্ষসোচিত মনোবৃত্তি আর রহিল না। ছয় মাস সমাধিমগ্ন থাকিয়া তপস্বিনী কর্কটী জাগরিত হইয়া অত্যন্ত ক্ষুৎকাতরা হইল। দেহ ও দেহাভিমান যতদিন থাকে, ততদিন ক্ষুধাদিও থাকে। সে এক্ষণ কি খাইবে—ভাবিতে লাগিল। অনাহারে প্রাণ গেলেও অন্ত্রায়, পূর্বক জীব-হিংসা সে আর

করিতে পারে না। সে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। তখন আকাশ হইতে বায়ুদেবতা তাহাকে বলিলেন—

‘হে কর্কটিকে, তুমি যাও, অজ্ঞানীদিগকে জ্ঞানদান কর। অজ্ঞানীকে উদ্ধার করা তত্ত্ববিদের কর্তব্য। যাহারা তোমার উপদেশে প্রবুদ্ধ না হইবে, তাহারা তোমার ভক্ষ্য হইবে।’

কর্কটী আকাশবাণী শুনিয়া দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,— ‘আপনি আমাকে বড়ই অনুগ্রহ করিলেন।’ তৎপর সে হিম-গিরি-শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া উপত্যকা প্রদেশস্থিত এক জনাকীর্ণ বহু সমৃদ্ধ কিরাত-রাজ্যে প্রবেশ করিল। তখন রাত্রিকাল। কিরাত-রাজ্যের মহা তেজস্বী রাজা নিজ মন্ত্রীসহ তস্করাদি দুর্বৃত্তদের দমনের জন্ত সেই রাত্রে বাহির হইয়াছিলেন। কর্কটী তাঁহাদিগকে বনমধ্যে দেখিয়া ভাবিল—ইহারা তাহার ভক্ষ্যরূপেই আসিয়াছে, কিন্তু ইহারা অজ্ঞানী কি জ্ঞানী পরীক্ষা না করিয়া হিংসা করিবে না। তৎপর রাক্ষসী মেঘগর্জনের শ্রায় গম্ভীর শব্দ করিল এবং বজ্রনির্ঘোষে রাজা ও মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

‘অহে ক্ষুদ্র কীটস্বরূপ ব্যক্তিদ্বয়, তোমরা কে? তোমরা কি মদীয় গ্রামে পড়িবার জন্ত এখানে আসিয়াছ? তোমরা সুবুদ্ধি, কি দুর্বুদ্ধি?’ রাজা বলিলেন—‘তুমি কে? এখানে এস, তোমার আকৃতি দেখি। তোমার উচ্চারিত শব্দে কে ভয় পায়? তুমি কি নিজেই ভীত হইয়া ঐরূপ বিকট শব্দ করিতেছ? তোমার এই প্রকার ক্রোধের কারণ কি? ক্রোধ ত্যাগ করিয়া

আমাকে তোমার সামর্থ্য দেখাও । আর যদি কিছু প্রার্থনা থাকে ত বল, আমি তোমার প্রার্থিত বস্তু দিব ।’

ককটী এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল, এবং বিকট নিনাদ ও হাস্য করিয়া রাজা ও মন্ত্রীর সম্মুখে আসিল । তাঁহারা দেখিলেন সম্মুখে এক মহারাক্ষসী, কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না । মন্ত্রী রাক্ষসীকে বলিলেন—‘তোমার ক্রোধপূর্ণ নিনাদ ত্যাগ কর । তুমি জানিবে যে, তোমার ঞ্চায় সহস্র সহস্র মশককে আমরা ধীরতারূপ প্রবল বায়ু দ্বারা উড়াইয়া দিয়াছি । তুমি কি চাও, বল ।’ মন্ত্রিবরের কথা শুনিয়া ককটী ভাবিল ইহারা সামান্য ব্যক্তি নহেন, কিন্তু ইহাদিগকে পরীক্ষা করিতে হইবে ।

ককটী । তোমরা কে ?

মন্ত্রী । নিশাচরি, ইনি কিরাতগণের রাজা, আমি ইহার মন্ত্রী । তোমার ঞ্চায় হিংস্র জীবের নিগ্রহার্থ আমরা এই রাত্রে বাহিরে আসিয়াছি ।

ককটী (রাজাকে) । হে রাজন্, তোমার মন্ত্রী দুর্বুদ্ধিযুক্ত । ঐরূপ যাহার মন্ত্রী, সে-রাজাকে রাজা বলা যায় না, সে দম্ভ । অধ্যাত্মজ্ঞানই উৎকৃষ্ট । যে-রাজার সেই জ্ঞান আছে, সেই রাজাই রাজা নামের যোগ্য । আর যে-মন্ত্রী সৎ-অসৎ বিচারে সমর্থ, সেই মন্ত্রীই যথার্থ মন্ত্রী । তোমরা যদি আত্মবিজ্ঞানহীন হও, তবে আমার ভক্ষ্য হইবে । তোমাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়—আমি যে সকল প্রশ্ন করিব, তাহার যথাযথ উত্তর দেওয়া । হে রাজন্, শীঘ্র তোমাকে আমার প্রশ্নাবলীর উত্তর

দিতে হইবে, অথবা হে মন্ত্রিন্, তুমিই উত্তর দাও। আমি এই বিষয়েই তোমাদের নিকট প্রার্থিনী, আমার অন্য কোন প্রার্থনীয় বস্তু নাই।

কিরাতপতি কৰ্কটকে প্রশ্ন করিতে বলিলেন। সেই মহানিশায়, সেই মহারাক্ষসী কৰ্কট বাঘট্রিটি (৬২) মহাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। কৰ্কটের প্রশ্নগুলির উত্তর কতক মন্ত্রী ও কতক রাজা দিয়াছিলেন। সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তরের স্থান হইবে না, কয়েকটা মাত্র নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। সমস্ত প্রশ্নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু একই।

প্রশ্ন। এক অথচ অনেক এইরূপ কোন্ পরমাণুর ভিতরে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড লীন হইয়া যাইতেছে ?

উত্তর। তোমার প্রশ্নের ভঙ্গীতে বুঝা গেল তুমি পরমাণু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ। নাম-রূপহীন, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম চিন্মাত্র স্বরূপ পরমাণুই যথার্থ অণু। বীজ মধ্যে বৃক্ষের ন্যায় সেই পরম সূক্ষ্ম চিৎ-স্বরূপে এই জগৎ সৃষ্টিকালে সৎ অর্থাৎ বিद्यমানরূপে, এবং প্রলয়কালে অসৎ অর্থাৎ অবিद्यমানরূপে ক্ষুরিত হইতেছে। জগতের যে সত্তা উপলব্ধি হয় (আছে এই জ্ঞান হয়), তাহা চিৎ-সত্তার অধীন।

প্রশ্ন। আমি কে, তুমিই বা কে ?

উত্তর। সেই পরমাণুই দ্বৈতজ্ঞানে তুমি আমি রূপে

প্রতিভাত হন। অদ্বয় জ্ঞানে তিনি তুমি-আমি রূপে অনুভূত হন না।

প্রশ্ন। কে গমন করে, অথচ গমন করে না ?

উত্তর। দেশ-কালাদি সমস্তই সেই চিহ্নপ অণুর সত্তা স্বরূপ। সুতরাং তিনি দেশ-কালাদিতে থাকিয়াও নাই (উহাদের পৃথক্ সত্তা না থাকায়), এবং কোথাও না গিয়াও সর্বব্যাপ্ত। দেশান্তর প্রাপ্তির জন্য গমনের প্রয়োজন। সমস্ত দেশ যাহাতে অবস্থিত, তিনি আর কোথায় যাইবেন ? ঘটটি স্থানান্তর করিলে যেমন তন্মধ্যস্থ আকাশের গমন উপচরিত হয় মাত্র, প্রকৃতপক্ষে আকাশ গমন করে না, সেইরূপ আত্মার গমনাগমন বাস্তব নহে।

প্রশ্ন। কে চেতন হইয়াও পাষণবৎ অচেতন ?

উত্তর। মিথ্যা জগতের সহিত তাদাত্ম্যকালে তিনিই জড়, নতুবা চেতন। অতএব জড় চেতন উভয়ই তিনি।

প্রশ্ন। পরমসূক্ষ্ম বস্তু কি ? প্রকাশ ও তমঃ উভয়ই কে ? কে-ই বা অস্তি বা নাস্তি হয় ?

উত্তর। একান্ত দুর্বোধ্যতা হেতু পরমাত্মাই পরম সূক্ষ্ম। দুর্বোধ বলিয়া তিনিই তমঃ, এবং জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তিনিই প্রকাশ। অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তিনিই আছেন এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না বলিয়া তিনি নাই, এইরূপ বলা যায়।

প্রশ্ন। কে নিমেষস্বরূপ হইয়াও কল্প এবং কল্প হইয়াও নিমেষ ?

উত্তরঃ যেমন মনোমধ্যে বহু বিস্তৃত নগর দেখা যায়, তেমনিই মনোমধ্যে কল্পব্যাপী ব্যাপারবিলাস নিমেষরূপে অনুভূত হয়। নিমেষ, কল্প, নগর ইত্যাদি সমস্তই এক চৈতন্তের অন্তঃস্থ হইয়াও মনঃকল্পিত ঐ ঐ রূপে প্রতিভাত হয়। ভাবানুসারে অসত্যও সত্য হয়, সত্যও অসত্য হয়; নিমেষও কল্প হয়, কল্পও নিমেষ হয়।

প্রশ্নঃ। কোন্ বস্তু প্রত্যক্ষ হইয়াও নাই, চেতন হইয়াও অচেতন? কে বায়ু হইয়াও অবায়ু? শব্দ কে, অশব্দই বা কে? কে সর্বস্বরূপ হইয়াও কিছুই নহে, অহং হইয়াও অনহং?

উত্তর। চিদ্বস্তু ইন্দ্রিয়গণের সার, অর্থাৎ তাঁহার সত্তাতেই ইন্দ্রিয়ের সত্তা; সুতরাং বাস্তবপক্ষে তিনিই প্রত্যক্ষ। আবার ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন বলিয়া তিনিই অপ্রত্যক্ষ। যতক্ষণ বলয়-জ্ঞান, ততক্ষণ সুবর্ণজ্ঞান থাকে না, আবার সুবর্ণজ্ঞান স্থায়ী হইলে বলয়জ্ঞান থাকে না। সেইরূপ যতক্ষণ দৃশ্যজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ আত্মচৈতন্যজ্ঞান থাকে না, আবার দৃশ্যজ্ঞান দূর হইলে একাদ্বয় নির্মল ব্রহ্মেরই অনুভূতি হয়। তিনিই আত্মরূপে চেতন, জগদ্রূপে অচেতন। ব্রহ্মাণুই নিজেকে বায়ুভাবে দর্শন করিয়া মায়াকল্পিত বিবর্তনে বায়ু হইয়াছেন। ইহা ভ্রান্তির মহিমা। সুতরাং পরমার্থ দর্শনে তিনি অবায়ু, ভ্রান্তি দর্শনে বায়ু, সেইরূপ তিনিই শব্দ সংবেদনে শব্দ, পরমার্থ দর্শনে অশব্দ ও শব্দের অগম্য। সেই চিদণুই সর্বস্বরূপ, অথচ কিছুই নহেন—অর্থাৎ নানাঙ্কবুদ্ধি দূর হইলে এবং ভেদবর্জিত অদ্বৈত-জ্ঞানের উদয়ে তাঁহার সর্ব-স্বরূপ

কর্কটী রাক্ষসী

৫৫

থাকে না। সেইরূপ অহংভাবে তিনি অহং, অহংভাববর্জিত অবস্থায় তিনি নাহং। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপে কর্কটী তাহার বাষট্টিটি প্রশ্নের সমুত্তর পাইয়া আনন্দ লাভ করিল। সে রাজা ও মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

‘হে ধীরদয়, এতক্ষণে বুঝিলাম আপনাদের বুদ্ধি অতি নিখিল ও বিশুদ্ধ। আপনাদের বিবেকামৃতসংযুক্ত বাক্য আমার অন্তঃ-করণ শুশীতল করিয়াছে। সাধু-সংসর্গে যে পরম শুভলাভ হয় ও সর্ব দুঃখের বিনাশ হয়, ইহা সত্য। আপনারা আমার সংকারের উপযুক্ত পাত্র। আমি আপনাদিগকে কোন বর প্রদান করিব ইচ্ছা করিতেছি। আপনাদের অভীষ্ট কি, শীঘ্র বলুন।’

রাজা বলিলেন—‘এই জনপদের অধিবাসীরা বিমূঢ়িকা রোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্টভোগ করে। আমি আশা করি তাহাদের কষ্ট মোচনের কোন উপায় বা উপদেশ তোমার নিকট পাইব। আমাদের রাত্রিচর্য্যার একটি উদ্দেশ্য ঐরূপ কোন উপায়ের সন্ধান করা। অন্য উদ্দেশ্য—তোমার ত্রায় যাহারা অস্ত্র লোক পাইলেই বধ করে, তাহাদিগকে দমন করা। এইজন্য এক্ষণে তোমার নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, তুমি প্রাণিহিংসা করিও না। আমাদের প্রার্থনা পূরণ করিলে কৃতার্থ হইব।’

কর্কটী হৃষ্ট হইয়া বলিল—‘রাজন, আজ হইতে আমি আর প্রাণি-হিংসা করিব না—এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম।’

রাজা। জীব-দেহ ভক্ষণ করিয়াই তোমাকে জীবনধারণ করিতে হয়। জীব-দেহ না খাইয়া তুমি কিরূপে বাঁচিবে ?

কর্কটী। রাজন্, এই পর্বতে আমি ছয় মাস সমাধিস্থ ছিলাম। সমাধিভঙ্গের পর আমার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল। তা' হউক, আমি এক্ষণ পুনর্ব্বার পর্বতশিখরে যাইয়া যতদিন ইচ্ছা সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়া থাকিব; তৎপর যথাকালে দেহত্যাগ করিব, তথাপি আর প্রাণিহিংসা করিব না। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি তাহা শুনুন।

এই কথা বলিয়া কর্কটী নিজের জন্ম, কৰ্ম্ম, তপস্যা, ব্রহ্মার বর ইত্যাদি বর্ণন পূর্ব্বক আত্মপরিচয় দিয়া বলিল—‘আমি ব্রহ্মার বরে বহুকাল বিস্মৃতিকা রোগ রূপে অসংখ্য প্রাণিবধ ও ভক্ষণ করিয়াছি। আমার আক্রমণ সাংঘাতিক ছিল। দৈবাৎ যাহারা পরিত্রাণ পাইত, তাহারাও অকৰ্ম্মণ্য হইয়া বাঁচিয়া থাকিত এবং তাহাদের সন্তান পরম্পরা রূগ্ণ ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিত। কিন্তু সেই বরেরই সর্ত্তানুসারে আমি গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে হিংসা করিতে পারি নাই। উক্ত রোগ বিনাশক যে মন্ত্র ব্রহ্মা আমাকে দিয়াছিলেন, আপনাকে তাহা দিতেছি, গ্রহণ করুন। আশ্বন, নদী-তীরে গিয়া কুতাচমন ও সংযত হইয়া আপনাকে মন্ত্র দান করি।’

কর্কটী যথাবিধানে রাজাকে বিচিস্রুকা মন্ত্র দান করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্ভত হইলে রাজা বলিলেন—‘হে বিপুলদেহ-শালিনি, আপনি আমাদের গুরু হইলেন। আমরা সম্মানে

আপনাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি, আপনি এই বিকট আকার ত্যাগ করিয়া আমার গৃহে আসিয়া থাকুন।’

কর্কটী। আমি মানবীরূপে থাকিলে মনুষ্যোচিত পান-ভোজন দিতে পারেন। কিন্তু যদি রাক্ষসীদেহে থাকি, তবে কি দিয়া আমার তৃপ্তি-সাধন করিবেন? রাক্ষসোচিত ভোজনই আমার তৃপ্তিপ্রদ, অন্য জীবের খাদ্য আমার তৃপ্তি হইবে না। কারণ যতদিন যে-দেহে বাস, ততদিন তদুচিত পূর্বসিদ্ধ স্বভাব নিবৃত্ত হয় না।

রাজা। আপনি কিছুদিন মানবীরূপেই আমার গৃহে থাকুন। তৎপরে আমি প্রচুর পরিমাণে আমার বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত অপরাধী ব্যক্তিদিগকে আপনার ভোজনার্থ সংগ্রহ করিয়া দিব। রাক্ষসীরূপে আপনি তাহাদিগকে হিমালয়-শৃঙ্গে লইয়া গিয়া যথাস্থে ভোজন করিবেন। গারে সমাধিস্থ হইতে পারেন। ইহাতে আপনার কোন অধর্ম হইবে না। কারণ ধর্মবিদগণ বলেন যে, ধর্মাল্লসারে হিংসা করণার সদৃশ। সমাধিভঙ্গে পুনরায় আমার গৃহে আসিবেন, আবার ঐরূপ ব্যবস্থা করিব।

কর্কটী এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। সে ছয় দিন রাজবাটিতে থাকিয়া তৎপরে রাজপ্রদত্ত প্রচুর ভক্ষ্য নরদেহ লইয়া হিমালয়ে চলিয়া গেল। বশিষ্ঠদেব আখ্যায়িকাশেষে বলিলেন যে, অদ্যাপি সেই জীবমুক্তা রাক্ষসী গিরিবনে বহু বর্ষ ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকে, পরে কিরাতরাজ্যে আসিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া চলিয়া

যায়। উক্ত রাজার উত্তরাধিকারিগণ অদ্যাপি সেই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন। কৰ্কটীর কৃপায় রাজ্য হইতে মারীভয়, পিশাচভয়, সৰ্ব্বপ্রকার মহোৎপাত বিদূরিত হইয়াছে। রাজারা উচ্চ প্রাসাদের মধ্যে ‘কন্দরা’ ও ‘মঙ্গলা’ এই দুই নামে কৰ্কটীর মূর্তি স্থাপন পূর্বক ব্রহ্মসহ দেবতাজ্ঞানে উহাকে পূজার্পণ করিয়া থাকেন। এই দেবতা বালবৎসগণের সৰ্ব্বপ্রকার শুভ সম্পাদন করেন।

বশিষ্ঠদেব উপসংহারে রামচন্দ্রকে বলিলেন—‘হে রাঘব, আমি ব্রহ্ম নিরূপণ উদ্দেশ্যে এই পরমার্থ-প্রদর্শিনী আখ্যায়িকা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম।’

কৰ্কটীর উপাখ্যানে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উপদেশ আছে। বিন্দুটিকাকে সাধারণ ভাষায় ‘ওলাউঠা’ বলে। এই রোগের নিদান অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ কি এবং প্রতিষেধ ও প্রতিকারের উপায় কি তাহা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মা-প্রদত্ত মন্ত্রটি পাঠক মূল গ্রন্থে অনুসন্ধান করিবেন এবং ইচ্ছা হয়ত পরীক্ষা করিয়াও দেখিতে পারেন। ঔষধ যেমন রোগ প্রতিকারের একটি উপায়, তেমনি মন্ত্রও অত্যন্ত উপায়। মন্ত্রশক্তি দ্বারা দুঃসাধ্যও সুসাধ্য হয়—ইহা পরীক্ষিত সত্য। শৌচ, সদাচার, সচ্চিন্তা, সংকল্প প্রভৃতি যে দৈহিক রোগেরও প্রতিষেধক—ইহা বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও স্বীকৃত।

অধিকাংশ মনুষ্যই সংসাররূপ মহারণ্যে, অজ্ঞানরূপ

মহানিশায়, তমোময়ী অবিভ্যাক্ষপ মহাৰাক্ষসীৰ ভক্ষ্যৰূপে বিচূৰণ
কৰে। যাঁহাৰা বিবেক-বিচাৰশীল, কেবল তাঁহাৰাই আত্মবিষয়ক
মহাপ্ৰশ্নেৰ যথার্থ নিৰূপণ দ্বাৰা ব্ৰহ্মবিজ্ঞা লাভ কৰিয়া অবিদ্যা-
ৰাক্ষসীৰ হাত হইতে মুক্তিলাভ কৰিতে পাবেন। আখ্যায়িকা
মধ্যে নিগূঢ় ভাবে এই উপদেশটি নিহিত আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সুলভা

সুলভা সন্ন্যাসিনী। স্ত্রী-জাতির বিধিপূর্বক সন্ন্যাসে অধিকার নাই—এইরূপ একটা মত আছে। কিন্তু কাম্যকর্ষাদি ত্যাগরূপ সন্ন্যাসে স্ত্রীলোকেরও যে অধিকার আছে ইহাতে কোন মতদ্বৈধ নাই। ইহার 'প্রমাণে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতির সহিত সুলভার নামও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। আমরা বক্ষ্যমাণ উপাখ্যানে দেখিব যে, সুলভা বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণশোভিত মিথিলার রাজসভায় সন্ন্যাসিনী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া বলিতেছেন যে তিনি পরিব্রাজক-ধর্ম পালন করিতেছেন,—এই কথায় এবং তিনি ত্রিদণ্ডধারিণী ছিলেন দেখিয়াও কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি সন্ন্যাসিনী বলিয়া সেই প্রাচীন যুগেও গৃহীত হইয়াছেন।

সুলভার বিবরণ মহাভারতের শান্তিপর্বে দৃষ্ট হয়। মোক্ষ কাহাকে বলে—ইত্যাদি যুধিষ্ঠিরের কয়েকটা প্রশ্নের উত্তরে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব সুলভা-জনক-সংবাদরূপ ইতিহাস বর্ণন করিয়াছিলেন। ভীষ্ম বলিতেছেন—সত্যযুগে মিথিলায় জনক-বংশে জাত ধর্মধ্বজ নামে একজন রাজা ছিলেন। আমরা সাধারণতঃ যে জনকের সহিত পরিচিত, তিনি সীতাদেবীর পিতা, রামচন্দ্রের সমসাময়িক, ত্রেতাযুগের লোক। মহাভারতের

কথায় বুঝা যাইতেছে যে, 'জনক' একটি বংশের নাম, কোন রাজাবিশেষের নাম নহে এবং এই বংশের রাজারা সত্যযুগ হইতেই মিথিলার সিংহাসন অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই বংশ-নামানুসারে জনক বলিয়া অভিহিত হইতেন। রামায়ণ হইতেও জানা যায় যে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা নিমির পুত্র মিথি প্রথম জনক। মিথির নামানুসারে রাজধানীর মিথিলা নাম। যজ্ঞে ত্রতী নিমি বশিষ্ঠ শাপে অচেতন হইলে ঋত্বিক্গণ অরণি দ্বারা তাহার দেহ মস্থন করিলে নিমির উৎপত্তি হইয়াছিল। সেইজন্য নিমি নাম, এবং ঐরূপে জাত বলিয়া জনক নাম। তদবধি রাজা ও রাজ্যের নামও বিদেহ হয়। ত্রেতাযুগের সীতা দেবীর পিতার নাম সীরধ্বজ জনক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে প্রসিদ্ধ জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ আছে তদুক্ত জনকও এই বংশসম্ভূত কোন নরপতি ছিলেন।

রাজা ধর্মধ্বজ জনক যেমন রাজধর্ম্যে নিপুণ ছিলেন, সেইরূপ মোক্ষধর্ম্যেও লব্ধপ্রবেশ ছিলেন। তাঁহার সাধু-জীবনও সকলের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। শুলভা সেই সময়ে সন্ন্যাসিনী হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন। ভ্রমণ-সময়ে অনেক দণ্ডী ও পরমহংস পরিব্রাজক মহাত্মাদের মুখে ধর্মধ্বজের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। কিন্তু রাজ্যশাসননিরত ধর্মধ্বজ প্রকৃতই মোক্ষধর্ম্যাবলম্বী কি না, এ বিষয়ে শুলভার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে ইচ্ছুক হইলেন। তৎপরে যোগবলে

নিজরূপ ত্যাগ করিয়া পরমা সুন্দরী মূর্তি ধারণ পূর্বক নিমেষমধ্যে জনাকীর্ণ মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা গ্রহণের (ভোজনার্থিনী) ছলে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অসাধারণ রূপবতী এই রমণীকে দেখিয়া ধর্মধ্বজ বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং মনে মনে প্রশ্ন করিলেন—ইনি কে, ইহার পিতা কে, কোথা হইতেই বা আসিলেন! পরে রাজা পাদ্যার্ঘ্যাদি নিবেদন করিয়া তাঁহার সৎকার ও উত্তম পান-ভোজনাদি দ্বারা তাঁহাকে তৃপ্ত করিলেন।

এইবার রাজা যথার্থ মোক্ষধর্মাবলম্বী কি না পরীক্ষার্থ সুলভা কোনপ্রকার মৌখিক প্রশ্নোত্তরের অপেক্ষা না করিয়া “স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিতে ও নেত্র দ্বারা তাঁহার নেত্রে প্রবেশ পূর্বক যোগবলে তাঁহাকে বশীভূত ও রুদ্ধ করিলেন।” এই যোগক্রিয়ার ফলে রাজা স্থলশরীর দ্বারা কোন কার্য্য করিতে অক্ষম হইলেন, সুলভারও স্থলশরীর কার্য্যাক্ষম হইল। বিদেহ-রাজ ধর্মধ্বজও যোগশাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন। তিনি সুলভার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন পূর্বক সুলভাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবি, তোমার নিবাস কোথায়? তুমি কাহার কন্যা? কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায়, যাইবে? আমার সম্বন্ধে তুমি যাহা অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছ, তাহা তোমাকে আমার বলা উচিত। পরাশর-গোত্রসম্ভূত সন্ন্যাসী মহাত্মা পঞ্চশিখ আমার গুরু। আমি তাঁহার কৃপায় সাংখ্যজ্ঞান, যোগ ও নিকাম যাগ-যজ্ঞকর্ম্ম—এই তিন প্রকার মোক্ষধর্ম্ম তত্ত্ব অবগত

হইয়াছি। তত্ত্বজ্ঞান দান করিয়াও তিনি আমাকে রাজ্যে থাকিতে নিষেধ করেন নাই। আমি ভগবান পঞ্চশিখের উপদেশানুসারে বিষয়ে আসক্তিহীন হইয়া রাজ্যমধ্যে থাকিয়া পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিয়া কালযাপন করিতেছি। ভজিত বীজের আয় আমার রাজ্যাদি-বিষয়ক জ্ঞান অঙ্কুরিত হয় না। স্ত্রীর প্রতি আমার অনুরাগ নাই, শত্রুর প্রতিও ঘেব নাই। কেহ আমার দক্ষিণ-হস্তে চন্দন লেপন করিলে এবং কেহ আমার বামহস্তে কুঠারদ্বারা ছেদন করিলে, আমি উভয়কেই তুল্য জ্ঞান করি। আমার যখন লোষ্ট্র-কাণ্ডনে সমজ্ঞান হইয়াছে এবং বিষয়ে আসক্তি নাই, তখন আমাকে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসীদিগের অপেক্ষা গরীয়ান্ মনে করা উচিত। মোক্ষের উপায়সম্বন্ধে কেহ কেহ সমধিক জ্ঞানযুক্ত কৰ্ম্মকে, কেহ কেহ সমধিক কৰ্ম্মযুক্ত জ্ঞানকে নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু আমার গুরু মহাত্মা পঞ্চশিখ এ দুই মতই ত্যাগ করিয়া বিগুণ জ্ঞানকেই মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীরাও ত' যম-নিয়মের অধীন এবং তাহাদের মধ্যেও দম্ভ-মান, রাগ-ঘেব দৃষ্ট হয়। তবে তাহারা কিসে শ্রেষ্ঠ? সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করিলেই মুক্ত হইবে, আর রাজারা রাজচিহ্ন ছত্রাদি ধারণ করিলে মুক্তি পাইবে না—ইহার কোন অর্থ নাই। যে গার্হস্থ্যের দোষ দেখিয়া উহা ত্যাগ ও অণু আশ্রম গ্রহণ করে, কোন একটা বস্তুর গ্রহণ-নিবন্ধন তাহাকেও সঙ্গত্যাগী বলা যাইতে পারে না। অতএব আমার মতে যে তত্ত্বজ্ঞানী—সে রাজাই হউক বা সন্ন্যাসীই হউক, সে-ই মোক্ষের অধিকারী।

মোক্ষ যদি জ্ঞানসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ফলমূল-ভক্ষণ, মস্তক-মুণ্ডন, দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিবার প্রয়োজন কি ? ঐ সকল সন্ন্যাস-আশ্রমের চিহ্নমাত্র ; কেবল চিহ্ন দ্বারা মোক্ষ হয় না। দরিদ্র মোক্ষভাগী হইবে, ধনবান হইবে না—এ কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আমি ত্যাগরূপ শানিত অসি দ্বারা সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়াছি, অতএব আমি রাজধর্ম পালন করিয়াও মুক্ত।

রাজা এইরূপে সন্ন্যাসীর অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিলেন। সুলভা গুনিয়া যাইতেছিলেন। পরে রাজা ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সুলভাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—সন্ন্যাসিনী বালয়া আমি তোমাকে শ্রদ্ধার সহিত সংস্কার করিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার যৌবন ও রূপলাবণ্যদর্শনে যোগবিষয়ে তোমার কুশলতা সম্বন্ধে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমি মুক্ত কি না—তুমি জানিতে আসিয়াছ এবং সেইজন্য তুমি আমার দেহ রক্ষা করিয়াছ—ত্রিদণ্ড ধারণ করিয়া তোমার এইরূপ কার্য্য নিতান্ত গর্হিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডধারণ তোমার পক্ষে নিষ্ফল হইয়াছে। তুমি যোগধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ—কারণ আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তুমি ব্যভিচারিণী হইয়াছ। কোন দিক্ দিয়াই তোমার এই কার্য্য দোষশূণ্য হয় নাই। বর্ণের দিক্ দিয়া তোমার সহিত আমার সংযোগে বর্ণসঙ্কর দোষ, আশ্রমের দিক্ দিয়া আশ্রম-সঙ্কর দোষ, আর তুমি আমার সগোত্রা হইলে গোত্র-সঙ্কর দোষ ঘটে। তুমি যদি বিবাহিতা হও, তাহা হইলে তুমি পরস্ত্রী বলিয়া আমাকর্তৃক

তোমার গ্রহণে ধর্ম-সম্বন্ধ দোষ হইবে। তুমি किसের জন্ত এইরূপ অবৈধ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তোমার কোন দুরভিসন্ধি আছে বলিয়া আমার মনে হয়। আমার ও আমার পক্ষীয়গণের অপকর্ম সাধন করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করা তোমার উদ্দেশ্য। আমি জীবন্মুক্ত কি না তুমি জানিতে চাহ। আমি সাধু, আমাকে স্পর্শ করিও না, এক্ষণে আমাকে ছাড়িয়া দাও, তোমার নিজ সন্ন্যাস ধর্ম পালন কর। আর এখানে আসিবার তোমার যদি অণু কিছু প্রয়োজন থাকে, তবে কপটতা ত্যাগ করিয়া তাহা বল।

মূলভা রাজার এই সকল অশ্রীতিকর তিরস্কার বাক্য ধৈর্য সহকারে শুনিলেন, কিন্তু শুনিয়া একটুও অসন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি মধুর বাক্যে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,— মহারাজ! আপনি যাহাকে যাহা বলিবেন তাহা অর্থযুক্ত, প্রসাদগুণবিশিষ্ট, মধুর ও অসন্দ্বিগ্ন হওয়া উচিত। জনসমাজে অর্থহীন, ঋতিকটু, অশ্লীলপদযুক্ত, অমূলক, অসঙ্গত, যুক্তিহীন বাক্য প্রয়োগ করা কদাপি বিধেয় নহে। আমি কামক্রোধাদি অথবা দম্ভ, লজ্জা, ভয় বা অভিমানের বশবর্তী হইয়া আপনার কথার প্রত্যুত্তর দিতেছি না, কিন্তু উত্তর দেওয়া কর্তব্য মনে করিয়াই উত্তর দিতেছি। বক্তা যদি শ্রোতাকে লক্ষ্য করিয়া গর্বিতভাবে কেবল নিজের বড়াই করে, তবে তাহা কখনই শ্রীতিপ্রদ হয় না। আপনি জানিতে চাহিয়াছেন—আমি কে, কাহার কণ্ঠা, কোথা হইতে আসিয়াছি, ইত্যাদি। ইহার উত্তর

দিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। ‘আমি’ বলিতে আপনি কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন? ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি যদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে ভ্রমজন্যই এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন; কারণ, আত্মা নিগুণ বলিয়া উহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। এই সকল গুণ যাহাতে থাকে, তাহার নাম ‘শরীর’। কেহ প্রকৃতিকে, কেহ পরমাণুকে, কেহ ঈশ্বর ও পরমাণু উভয়কে, কেহ ঈশ্বর-মায়া-শক্তি-জীব-অবিচ্ছিন্ন—এই চারিটিকে ঐ সমস্ত গুণের কারণ বলিয়া থাকেন। সমস্ত জীবশরীরই শুক্র-শোণিতজাত। গর্ভमध्ये শুক্র-শোণিত সংযোগে কলল, বুদ্ধদ, মাংসপেশী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নখ-রোম, ইত্যাদিক্রমে অঙ্গসংস্থান সম্পূর্ণ হইলে নবম মাস উত্তীর্ণ হওয়ার পর জীব ভূমিষ্ঠ হয়, এবং চিহ্নানুসারে উহার স্ত্রী বা পুরুষ নাম নির্দিষ্ট হয়। ঐ জীব ক্রমে শৈশব, কৈশোর, যৌবন অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জীবের যে অবস্থা একবার অতিক্রান্ত হয়, তাহা আর ফিরিয়া আসে না। অতি অল্পে অল্পে অবস্থার পরিবর্তন হয় বলিয়া অনুভবগম্য হয় না, যেমন প্রদীপশিখার হাসবুদ্ধি অল্পে অল্পে হয় বলিয়া অনুভবযোগ্য হয় না। যেমন অশ্ব এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনমান হয়, সেইরূপ জীবের দেহ এক অবস্থা হইতে অল্পে অবস্থায় চলিয়া যায়। যে দেহ প্রতিক্ষণেই এইরূপে পরিবর্তিত হইতেছে, তাহা কাহার বা কোন্ স্থান হইতে আসিল—ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। দেহের সম্বন্ধে এই কথা। আর যে দেহী, তাহা ত’ জড়দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। একই

আত্মা সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত। অতএব আপনি নিজকে
 যেরূপ জ্ঞান করেন, অতীতও সেইরূপ জ্ঞান করা আপনার
 কর্তব্য। যদি সেইরূপ তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন আপনি হইয়া থাকেন,
 তবে আপনি কি নিমিত্ত—আমি কে, কাহার ভাৰ্য্যা, এই প্রকার
 প্রশ্ন করিতেছেন? যদি স্বার্থ-পরার্থজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকেন,
 তবে আমি কাহার কণ্ঠা, কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছি—
 এই প্রশ্ন করা আপনার অনুরূপ। আপনি রাজা,—রাজকীয়
 ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়া শত্রু, মিত্র ও মধ্যস্থের প্রতি ভিন্নরূপে
 ব্যবহার করেন বলিয়া, এবং সন্ধি-বিগ্রহে আপনার আসক্তি
 আছে বলিয়া এখনও আপনার সেই সমস্তবুদ্ধি হয় নাই।
 অতএব আপনাকে কিরূপে মোক্ষপদাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করা
 যায়? দেখিতেছি—আপনি মোক্ষের অধিকারী না হইয়াও
 আপনাকে মুক্ত বলিয়া আপনি জ্ঞানিতেছেন। যে ব্যক্তি
 জ্ঞান প্রভৃতি সংসর্গের বিষয়সমূহকো-আত্মা হইতে অভিন্নরূপে
 দেখে, তাহাকেই যথার্থ মুক্ত বলা যায়। সমাগরা ধরার
 রাজাকেও নিজ পুরমধ্যে থাকিতে হয়, রাত্রিকালে কোন একটা
 প্রকোষ্ঠের একাংশে একটি খটায় শয়ন করিতে হয়—সেই
 খটারও অর্দ্ধাংশ তাহার জ্ঞান অধিকার করিয়া থাকে। একজন
 রাজার একটি খটার অর্দ্ধাংশেই যদি কার্য চলিয়া যায়, তবে
 বিস্তৃত পৃথিবী অধিকার করিয়া তাহার কি ফল? ভোজন ও
 আচ্ছাদন বিষয়েও অতি অল্প দ্রব্যেরই প্রয়োজন।

আবার দেখুন, রাজাকে সতত পরের অধীন থাকিতে হয়।

সকল বিষয়েই যাহাকে মন্ত্রিগণের পরামর্শ গ্রহণ ও দোষগুণ বিচার করিয়া নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে হয়, তাহার স্বাধীনতা কোথায় ? শত্রুর ত কথাই নাই, ধনী, জ্ঞানী, তপস্বী, সকলের নিকটই রাজাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয় ; কারণ, উহারা সহজেই রাজার ক্ষতি করিতে পারে। তারপর আপনি আপনার রাজ্য, প্রাসাদ, ধনকোষ, অমাত্যগণ আছে বলিয়া যে গর্ব করেন, তাহারও কোন যুক্তি নাই। কারণ, ছোট বড় প্রত্যেকেরই গৃহ, ধনভাণ্ডার, মিত্র, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি আছে এবং নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই এক একটি রাজার আয়। বিশেষ এই যে, আপনাকে শত্রুর আক্রমণে সর্বদা অধিকতর শঙ্কিত হইয়া দিনযাপন করিতে হয়। রাজ্যভার দুঃখপূর্ণ, তৃণাগ্নি ও জলবুদ্ধদের আয় ক্ষণবিনাশী—এইরূপ অবস্থায় রাজ্যভার বহন করা মূর্থতা মাত্র। রাজা যদি শাস্ত্রাচার ও শতিক্রম করিহইতে একটুও বিচলিত না হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিধিবশাতিহেয়া প্রজাপালন করিতে পারেন, তবে তাঁহার পৃথিবী-দানসহ অশ্বমেধের ফল অপেক্ষাও অধিক ফল লাভ হয় বটে, কিন্তু কোন রাজাই সম্পূর্ণরূপে রাজধর্ম পালন করিতে সক্ষম নহেন।

আপনি আমাকে আপনার শরীর স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন,—আপনার এইরূপ মনোভাব নিতান্ত বালকোচিত। আমার নিজের দেহের সহিতই আমার সংস্পর্শ নাই, অত্বে দেহের সহিত কিরূপে থাকিবে ? আপনি বলিয়াছেন যে, গুরু পঞ্চশিখের মুখ হইতে সমুদয় মোক্ষধর্ম অবগত হইয়াছেন।

যদি তাহাই হয়, তবে আমাকে বর্ণসঙ্করকারিণী বলিয়া কিরূপে
 তিরস্কার করিলেন? আপনি যদি রিপুজয় পূর্বক সঙ্গরহিত
 হইয়া থাকেন, তবে রাজচিহ্ন ছত্রাদির সহিত আপনার সম্বন্ধ
 রহিয়াছে কিরূপে? ইহাতে আমার মনে হয়, আপনি বেদ
 শ্রবণ করেন নাই, করিয়া থাকিলেও উহা আপনার পক্ষে
 ফলোপধায়ক হয় নাই, অথবা বেদভ্রমে অন্য কোন শাস্ত্র
 গুনিয়াছেন। কারণ, আপনাতে তত্ত্বজ্ঞানের কোন চিহ্ন দেখিতে
 পাই না। আপনি কেবল লৌকিক ব্যাপারেই বদ্ধ আছেন।
 সেইজন্য আপনি প্রাকৃত জনের ত্রায় স্পর্শ ও অবরোধ দ্বারা রুদ্ধ
 হইয়াছেন। সত্ত্বগুণবলে পদ্যপত্রস্থিত জলের ত্রায় নির্লিপ্তভাবে
 আমি আপনার শরীরে প্রবেশ করিয়াছি—আপনি জীবমুক্ত
 কি না পরীক্ষা করিতে। সে পরীক্ষায় আপনি উত্তীর্ণ হইতে
 পারিলেন না; কারণ, আপনি জীবমুক্ত হইলে আমার
 এক্রূপ দেহ প্রবেশ জন্য আপনার কোন ক্ষতি হইয়াছে—এক্রূপ
 মনে করিতে পারিতেন না। পঞ্চশিখের প্রসাদে আপনার
 জ্ঞান বিষয়-সংস্পর্শশূন্য হইয়াছে—ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব?
 এক্ষণে আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি—আপনি ‘ইতো ব্রহ্মস্ততো নষ্টঃ’
 হইয়াছেন,—গাহ’স্থ্য-ধম্ম’ হইতে ব্রহ্ম এবং মুক্তিপদ লাভে অসমর্থ
 হইয়া উভয়ের মধ্যবর্তী দশাপন্ন হইয়া আছেন। মুক্তের সহিত
 মুক্তের সংযোগ হইলে কি কখন বর্ণসঙ্কর হয়? যাহারা দেহকেই
 আত্মা বলিয়া মনে করে, এবং যাহাদের বর্ণ ও আশ্রমের নানা
 ধর্মসম্বন্ধে পৃথক্ বুদ্ধি আছে, তাহাদেরই বর্ণসঙ্কর জ্ঞান হয়।

হস্ত ও হস্তধৃত পাত্র, পাত্র ও পাত্রমধ্যস্থ তুষ্ক, তুষ্ক ও তুষ্কস্থিত মক্ষিকা যেমন একত্র থাকিলেও পরস্পর মিশ্রিত হয় না, তদ্রূপ বর্ণ ও আশ্রমের ধর্মসকল ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে মিলিত হইলেও মিশ্রিত হয় না—পৃথকভাবে থাকে।

আপনি রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ প্রধানের নাম শুনিয়া থাকিবেন। আমার এই শরীর তাঁহারই বংশে জাত—ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্রবংশে নহে। আমার নাম সুলভা। গুরুজনেরা আমার বিবাহের জন্ত চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু আমার উপযুক্ত বর মিলিল না দেখিয়া তাঁহারা আমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে উপদেশ প্রদান করেন। আমি তদনুসারে মুনিব্রত গ্রহণ করিয়াছি এবং একাকিনী ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছি; আমি কপট সন্ন্যাসিনী নহি। আমি নিজ ধর্ম্মানুসারেই চলিতেছি। ধর্ম্মসঙ্কর করা আমার দ্বারা হইতে পারে না। আমি ভালরূপ বিচার না করিয়া আপনার নিকট আসি নাই। আপনি মোক্ষধর্মে নিপুণ—ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছিলাম। যাহা বলিতেছি, তাহাও বিবেচনা না করিয়া বলিতেছি না। পক্ষপাতশূন্য হইয়াই আপনাকে বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি বিতণ্ডাপরায়ণ সে কখনই মোক্ষলাভে অধিকারী নহে। বিবাদ ত্যাগ করিয়া যে ব্রহ্মে নিমগ্নচিত্ত হয়, তাহারই মোক্ষলাভ হয়; আর আপনার বোধশূন্য কার্য্যাক্রম শরীরে যে আমার অবস্থান, উহা যেমন নগরমধ্যে কোন শূন্য স্থান দেখিলে সন্ন্যাসীরা তথায় রাত্রিবাস করে, সেইরূপ।

আজ আমি আপনার শরীরে বাস করিয়া কল্য এস্থান হইতে চলিয়া যাইব। আপনি আমার যথেষ্ট সৎকার করিয়াছেন এবং আমি আপনার বাক্যে সন্তুষ্টই হইয়াছি।

শুলভার অর্থপূর্ণ ও হেতুগর্ভ কথাগুলি শুনিয়া মহারাজ জনক তাহার আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না—চুপ করিয়া রহিলেন। মোক্ষ কাহাকে বলে—যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তর ভীষ্মদেব শুলভার বাক্য দ্বারা প্রদান করিলেন।

মহাভারতে ব্রহ্মবাদিনী শুলভার কথা এইখানেই শেষ হইয়াছে। শুলভার আত্মপরিচয়ে জানা গেল—তিনি প্রধান নামক জ্ঞানৈক বিখ্যাত ক্ষত্রিয় রাজর্ষির বংশসম্ভূতা এবং তিনি প্রথমতঃ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী দুই প্রকার—উপকুর্বাণ ও নৈষ্ঠিক। উপকুর্বাণ গুরুর আদেশক্রমে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দার-পরিগ্রহাদি করিতে পারেন। কিন্তু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গৃহে ফিরিবার বিধি নাই। তাঁহাকে হয় আজীবন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান, অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। অতএব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীও এক প্রকার সন্ন্যাসীর তুল্য।

আর একটি কথা শুলভার আত্মপরিচয় হইতে জানা গেল। তাহা এই যে, সেই যোগ, তপস্যা, বেদজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের যুগেও শুলভার পানিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত কোন পাত্র পাওয়া যায় নাই। শুলভার মতিগতি, সংস্কার-প্রবৃত্তি যে অল্পবয়স হইতেই অপর বালক-বালিকা হইতে অতীব বিশুদ্ধ ছিল,

এবং তাঁহার জীবন-প্রবাহ যে একটি অনন্যসাধারণ ধারামুখে প্রবাহিত ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। শুলভা জন্মান্তরীণ সাধন-সজ্জাত আত্মবোধের প্রবল সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উহা এত উচ্চকোটির ছিল যে, সেই প্রাচীন যুগের কোন সুশিক্ষিত পুরুষের মধ্যেও তাহা দেখা গেল না। শুলভার উচ্চ ব্রহ্মমুখী মনোবৃত্তির সহিত সমঞ্জস হয় এইরূপ সংস্কারসম্পন্ন পাত্র সংসারে একান্ত দুর্লভ দেখিয়া আত্মীয়বর্গ পরিণামে দুঃখকর হইবে স্থির করিয়া তাঁহার বিবাহের চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যায় কোন বিবাহার্থীই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না বলিয়া বিবাহক্ষেত্রে যে শুলভা ছিলেন একান্ত দুর্লভা, তাহা বুঝা যায়।

যুধিষ্ঠিরের যে সকল প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব শুলভা-জনক সংবাদ বিবৃত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে (কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতানুসারে) মোক্ষ কাহাকে বলে—ইহা ব্যতীত (১) কোন্ ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়া মোক্ষতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং (২) লিঙ্গশরীর ও শূলশরীর কিরূপে পরিত্যাগ করিতে হয়— এই দুইটি প্রশ্নও ছিল। মোক্ষ কাহাকে বলে—তাহার একটি স্পষ্ট ধারণা আমরা উপরে বর্ণিত সংবাদ হইতে পাই। কিন্তু অপর দুইটি প্রশ্নের মধ্যে প্রথমটির উত্তরে হয়ত ধর্মধ্বজ জনককে গৃহস্থ ও মোক্ষতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে। সন্ন্যাসিনী শুলভার মতে কিন্তু ধর্মধ্বজ গার্হস্থ্যধর্ম ও মুক্তিপদ উভয়তঃ ভ্রষ্ট। তবে একটু অনুধাবন করিলে মনে হয় যে, শুলভার

সুলভা

প্রতিবাদে ধর্মধ্বজকে মোক্ষতত্ত্ব বলিতে বিশেষ অর্পিত দেখা যায় না, কিন্তু ধর্মধ্বজ যে নিজকে জীবমুক্ত বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন এবং সর্বব্যাপী সন্ন্যাসীদের অপেক্ষাও নিজকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রগল্ভতা প্রকাশ করিতেছিলেন—ইহাই ছিল সুলভার প্রতিবাদের আশয়। সেইজন্য সন্ন্যাসধর্মের তুলনায় রাজধর্ম যে কত প্রকার দুঃখের আকর, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। সুলভা যেন ধর্মধ্বজকে বলিতেছেন—তুমি শাস্ত্র পড়িয়া বা গুরুমুখে শাস্ত্র শুনিয়া মোক্ষতত্ত্ব কি তাহা পরোক্ষভাবে বুঝিলেও তোমার জীবমুক্তিপন লাভ করিবার দাবী একেবারেই অগ্রাহ্য। কারণ, তোমার অহঙ্কৃত ভাব ও অত্যাচার উক্ত দাবীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। দ্বিতীয় প্রশ্নটি—লিঙ্গশরীর ও স্থলশরীর কিরূপে ত্যাগ করিতে হয়—তাহার কোন সুস্পষ্ট উত্তর উক্ত সংবাদে পাওয়া যায় না। লিঙ্গশরীর ত্যাগের কোন কথাই উদ্ভূত নাই। স্থলশরীর ত্যাগের কথা আছে; কিন্তু কিরূপে ত্যাগ করিতে হয়, সে কথা স্পষ্ট নাই। যোগীরা যে স্থলশরীর ত্যাগ করিতে পারেন এবং সুক্ষ্মদেহে যথেষ্ট গমনাগমন করিতে পারেন, তাঁহাতে কোন সন্দেহ নাই। মৃত্যুসময়ে যেমন স্থলশরীর হইতে লিঙ্গশরীর একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, যোগীদের কিছু সময়ের জন্য স্বেচ্ছাকৃত স্থলশরীর ত্যাগে তাহা হয় না—উভয় শরীর মধ্যে তখনও একটা সম্বন্ধমুত্র থাকে, যাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা অভিপ্রেত কার্য্যান্তে আবার স্থলশরীরে কিরিয়া আসিতে পারেন। সুলভা ও জনকের উভয়েরই সেই

শক্তি ছিল দেখা যায় ; অধিকন্তু স্থলভার পরকায় প্রবেশ-শক্তিও দৃষ্ট হয়। ইহাও যোগজ-ঐশ্বর্য্য। যিনি স্থলশরীর ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারই পক্ষে পরকায়প্রবেশ সম্ভব। কিন্তু স্থলশরীর ত্যাগক্ষম যোগিমাত্রেরই যে পরকায়-প্রবেশক্ষমতা থাকিবে এমন কোন কথা নাই। পঞ্চভূতের স্থল-সূক্ষ্মাদি কয়েক-প্রকার রূপের উপর যিনি সংযমসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার ‘ভূতজয়’ নামক একটা সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ পঞ্চভূত যোগীর সঙ্কল্পের বশীভূত হয়। বৎস যেমন গাভীর পশ্চাদনুসরণ করে, পঞ্চভূতও সেইরূপ যোগীর সঙ্কল্পের অধীন হইয়া চলে। যোগসূত্রে আছে—

‘ততোহগ্নিমাди प्रादुर्भावः, कायसम्पत्, तद्वर्मानभिघातक।’ (৩।৪৫)

অর্থাৎ ভূতজয়ের ফলে অগ্নিমাди অষ্টৈশ্বর্য্য, কায়সম্পৎ এবং দেহধর্ম্মের বাধাশূন্যতা (অনভিঘাত)—এই তিনটি সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। এই স্থলে তৃতীয়টাই আমাদের বিবেচ্য। দেহধর্ম্মের বাধাশূন্যতার অর্থ এই যে, তখন বস্তু সকলের কাঠিআদি ও শৈত্যাди ভূতধর্ম্মসমূহ সেই সেই বস্তুতে যোগীর প্রবেশের পক্ষে বাধাজনক হয় না—তিনি অনায়াসে প্রস্থরের মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারেন। ইহা হইল ভূতপ্রবেশ ক্ষমতা। পরকায়-প্রবেশের প্রক্রিয়া ইহা হইতে অন্তরূপ, যথা—

‘বন্ধকারণটেশখিল্যাৎ প্রচারসংবৎসরানাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরপ্রবেশঃ।’ (৩।৩৮)

চিত্তের স্বভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উহা দেহের মধ্যে

ও দেহের দ্বারা যেন সঙ্কুচিত হইয়া আছে। ইহাই দেহের বন্ধন, এবং ইহার কারণ হইতেছে ধর্ম ও অধর্ম। সংযম দ্বারা ধর্মাদ্বয়ের শিথিলতা হয়। কখন কোন্ নাড়ীতে চিত্তের সঞ্চরণ হইতেছে, সংযম দ্বারা ইহাও জানা যায় (প্রচার সংবেদনাৎ)। এই দুই প্রকার উপায়ে সিদ্ধ হইলে যোগী যে-কোন জীবিত বা মৃত পরকীয় দেহে প্রবেশ করিতে পারেন, যেমন কোন রজ্জুবদ্ধ পুরুষের বন্ধনটী যদি খুলিয়া দেওয়া যায় এবং তাহার যদি পথ চেনা থাকে, তবে সে অনায়াসে ইচ্ছামাত্রই অপরের গৃহে প্রবেশ করিতে পারে।

শূলভার এই যোগৈশ্বর্য ছিল। মহাভারতের বিবরণে দেখি—তিনি বুদ্ধি দ্বারা ধর্মধ্বজ জনকের দেহে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। ইহাতে শূলভার পরকায়-প্রবেশের অস্পষ্ট আভাস মাত্র আছে, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা পরকায়-প্রবেশ কিরূপে হয়, তাহা মহাভারতের সংক্ষিপ্ত কথায় সকলে হয়ত স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন না। উপরোক্ত যোগসূত্র দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত হইল। বুদ্ধি ও যোগশাস্ত্রোক্ত চিত্ত একই কথা, উভয়ই অন্তঃকরণরূপ। যেখানে যেখানে বুদ্ধি বা চিত্ত যায়, সেখানে সেখানে সূক্ষ্মরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণও সঙ্গে সঙ্গে যায়—যেমন মধুমক্ষিকাদের রাজা উড্ডীন হইলে মক্ষিকাগুলিও উহার অনুসরণ করে। ঐ ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও অন্তঃকরণ লইয়া সূক্ষ্মশরীর গঠিত। অতএব এতদ্বারা কিরূপে শূলশরীর হইতে সূক্ষ্মশরীর নির্গত হয় তাহাও বুঝা যায়।

সুলভার উপাখ্যানে দেখা যায় যে তাঁহার আরও একটি যোগৈশ্বর্য ছিল। তিনি ইচ্ছামাত্র নিমেষমধ্যে সুদূর স্থান হইতে মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যোগশাস্ত্রে ইহারই নাম 'মনোজবিহ্ব'। যোগবল দৃষ্টিতে ইহাও তুচ্ছ নহে। চক্ষু-কর্ণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকের যে 'গ্রহণ', 'স্বরূপ' ইত্যাদি পাঁচপ্রকার রূপ আছে, তাহাদের সংযমে 'মনোজবিহ্ব' অর্থাৎ মনের দ্বারা দেহেরও গতি-শক্তি লাভ হয়।

সুলভা যে ইচ্ছামাত্র পূর্ব রূপ পরিত্যাগ করিয়া পরম সৌন্দর্য্যমণ্ডিত একটি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা যোগিজনের পূর্বোক্ত 'কায়সম্পদের' একটা দিক্ মাত্র।

সুলভার উচ্চ যোগশক্তির প্রমাণ আরও একটি ব্যাপার হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি চিত্ত দ্বারা রাজার দেহে প্রবেশ করা সত্ত্বেও সুলদেহ দ্বারাই তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছিলেন। যোগশাস্ত্রে দেখা যায় যে, উচ্চ যোগীরা অল্প সময়ের মধ্যে কর্মভোগ শেষ করিবার জন্য অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ দ্বারা ভোগক্ষয় না করিতে হয় এইজন্য এক সময়েই অনেক দেহ নির্মাণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার ভোগ সম্পাদন করেন। সেই সকল দেহের প্রত্যেকের মধ্যেই এক একটি চিত্ত থাকে। ঐ সকল দেহকে বলে 'নির্মাণকায়', এবং ঐ সকল চিত্তকে বলে 'নির্মাণচিত্ত'—যোগশক্তিবলে নিম্নিত হয় বলিয়া ঐরূপ নামে উহার অভিহিত হয়। নির্মাণচিত্তগুলি অনেক হইলেও উহাদের মধ্যে একটির সর্বপ্রাধান্য থাকে এবং সেইটি অন্য সকলের নিয়ামক

হয়। ভোগের অনুকূল নানা প্রবৃত্তি ঐ সকল, চিন্তামধ্যে থাকিলেও একটি মাত্র নিয়ামক চিত্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় যোগীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে না। এ বিষয়ে 'প্রকৃতিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকবাহু' (৪।৫) যোগসূত্রটি দ্রষ্টব্য। জনক-প্রসঙ্গে শুলভার অনেক দেহ ও চিত্ত নির্মাণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু তাঁহার চিত্ত রাজদেহে প্রবেশ করার পর শূলদেহ প্রথমতঃ কার্য্যাক্ষম হইলেও যখন রাজার উক্তির প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন হইল, তখন তিনি চিত্তকে রাজদেহ হইতে বিযুক্ত না করিয়াই শূলদেহে তাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। শূলদেহে একটি নির্মাণচিত্ত না করিয়া ইহা সম্ভবপর হয় না। ইহা দ্বারা শুলভা যে উন্নতকোটির যোগিনী ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয়। তিনি যেমন উচ্চ যোগৈশ্বর্য্যশালিনী ছিলেন, তেমনি তত্ত্বদর্শিনী ব্রহ্মবিদুষীও ছিলেন। আমাদের বর্তমান নারী-সমাজে আর একটি শুলভা-চরিত্রের আবির্ভাব দেখিতে পাইব কি ?

LIBRARY

No.

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

চতুর্থ অধ্যায়

গার্গী

ব্রহ্মবাদিনী গার্গী বাচরু নামক এক ব্রাহ্মণের ছুহিতা। সেইজন্য তিনি বাচরুবী নামে আখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার বাল্য-জীবন কিরূপ ছিল এবং পরেই বা তিনি কি প্রকারে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদগণের মধ্যেও উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। পুরাকালীন কোন মহান পুরুষ বা মহীয়সী নারী সম্বন্ধে যেমন কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না, বাচরুবী গার্গী সম্বন্ধেও সেই কথা; ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অরুন্ধতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি। কারণ ইহারা পৌরাণিক যুগের নরনারী। কিন্তু গার্গী ছিলেন বৈদিক যুগের নারী। সে যুগের যে সকল পুরুষ বা স্ত্রী ব্রহ্মবিচার-ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে পুরাণপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের ন্যায় বিশেষ কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

গার্গীর পরিচয় আমরা পাই বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত মহারাজ জনকের সভায়। জনক এক সময়ে একটি ভূরিদক্ষিণা-যুক্ত মহাঘজের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের কুরু ও পাঞ্চাল নামক দেশদ্বয় বিদ্বদ্ভুল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ সকল দেশের যত্ন বরণীয় বেদবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া জনকের

যজ্ঞে আসিয়াছিলেন। এক মহতী সভায় তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়াছিলেন। মহারাজ জনক স্বয়ং ব্রহ্মবিদ ছিলেন। সভাস্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও বহু ব্রহ্মবিদ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু জনকের জানিতে ইচ্ছা হইল যে, ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিত্তম কে? সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার ব্যবস্থাক্রমে সভার নিকটস্থ গোষ্ঠে এক সহস্র উত্তম গাভী দানার্থ রক্ষিত হইল। শুধু এক সহস্র গাভী নহে, অধিকন্তু প্রত্যেক গাভীর শৃঙ্গদ্বয় সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া রাখা হইল। তৎপর তিনি সমবেত ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—‘যিনি আপনাদের মধ্যে ‘ব্রহ্মিষ্ঠ’ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ, তিনি এই সুবর্ণমণ্ডিত-শৃঙ্গ গরুগুলি আপন গৃহে লইয়া যাউন।’ সকলেই নির্বাক,—কেহই আপনাকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিবার সাহস প্রকাশ করিলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার সামন্ত্রবা নামক এক ব্রহ্মচারী শিষ্যকে আদেশ করিলেন—‘তুমি এই গরুগুলি আমার গৃহে লইয়া যাও।’ গুরুর আদেশানুযায়ী শিষ্য গরুগুলি লইয়া যাইতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—‘যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কি হেতু আপনাকে আমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতেছ?’ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে হইতে স্বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠাভিমানী অশ্বল নামক জনক রাজার একজন ঋষিকৃ অগ্রসর হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে ভৎসনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ কি না নিশ্চয় করিয়া বল?’ যাজ্ঞবল্ক্য যে

আপনাকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার গো গ্রহণদ্বারাই স্মৃতিত হইয়াছিল। তথাপি যাজ্ঞবল্ক্যের মুখ হইতেই ইহা শুনিবার জন্য অশ্বল ঐক্লব প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নটির সাক্ষাৎভাবে কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন—‘যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ তাঁহাকে আমাদের নমস্কার। বর্তমান সময়ে আমি গো-কাম, আমার গরুর প্রয়োজন, সেইজন্য শিষ্যকে গরুগুলি লইয়া যাইতে বলিয়াছি।’ ইহা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে না হউক প্রকারান্তরে যাজ্ঞবল্ক্য নিজকে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়াই প্রকট করিলেন। কারণ রাজার নির্দেশানুযায়ী ব্রহ্মিষ্ঠ ভিন্ন অন্য কেহ গো-গ্রহণের অধিকারী নহেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া অশ্বল যাজ্ঞবল্ক্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য সভামধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্বজ্জনশোভিত সেই সভাস্থলে তখন এক মহা শাস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল। যাজ্ঞবল্ক্য একে একে অশ্বলের সমস্ত প্রশ্নের যথাশাস্ত্র উত্তর প্রদান করিলেন। অশ্বল আর অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় বিরত হইতে বাধ্য হইলেন।

অশ্বলের পর ক্রমে ক্রমে যাহারা শাস্ত্রযুদ্ধে যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করিবার জন্য উদ্যম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—অর্ধভাগ, ভূজ্য, উষস্ত (চাক্রায়ণ), কহোল, গার্গী, উদালক (অরুণ ঋষির পুত্র), গার্গী (দ্বিতীয়বার) এবং শাকল্য। ইহারা সকলেই ব্রহ্মবিৎ বলিয়া খ্যাত। তন্মধ্যে কয়েকজন উপনিষৎপ্রসিদ্ধ। সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাস্ত করা, কিন্তু কেহই সফলকাম হন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য একাই

সকলকে পরাস্ত করিয়া নিজ বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়টি সম্পূর্ণরূপে এই ব্রহ্মবিচারে সমলঙ্কৃত। উক্ত ঋষিগণের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ব্রহ্মবিজ্ঞানের যে উচ্চতম সিদ্ধান্তরাশি যাজ্ঞবল্ক্যের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে তাহা অশ্রুত দুর্লভ। সেইজন্য এই অধ্যায়টিকে ভাষ্যকার আচাধ্য শঙ্কর 'যাজ্ঞবল্ক্যীয় কাণ্ড' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ছয়টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং প্রত্যেক অধ্যায় কয়েকটি ব্রাহ্মণে বিভক্ত। শুরু যজুর্বেদের ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত বলিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদের এক একটি প্রকরণ এক একটি ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। অতএব 'ব্রাহ্মণ' অর্থে প্রকরণ। 'কাণ্ড' অর্থেও 'প্রকরণ'। কেবল যাজ্ঞবল্ক্যের বিজয়ঘোষণার্থ এই প্রকরণটিকে 'যাজ্ঞবল্ক্যীয় কাণ্ড' বলা হয় নাই, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে সকল অহুৎকৃষ্ট, পরম উপাদেয় তত্ত্বরাশি উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকের নয়টি ব্রাহ্মণে সমাপ্ত এই অংশটিকে যাজ্ঞবল্ক্যেরই কাণ্ড বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বাংলা ভাষায় 'কাণ্ড' বলিতে আমরা একটা কিছু অসাধারণ বা অদ্ভুত ব্যাপার বুঝি— তাহা প্রশংসাযোগ্য বা নিন্দনীয় যাহাই হউক। যাজ্ঞবল্ক্যের এই শাস্ত্রযুদ্ধেও কিছু অসাধারণ ও অদ্ভুত আছে। তাহা হইতেছে সেই সভামধ্যেই অস্তিম শাস্ত্রযোদ্ধা শাকল্য ঋষির মস্তকপাত। অস্ত্রযুদ্ধে কাহারও মস্তকপাত কিছুই আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু শাস্ত্রযুদ্ধে প্রতিপক্ষের মস্তকপাত করা আশ্চর্য্য নহে কি ?

একটি একটি করিয়া শাকল্যের উত্থাপিত বহু জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য স্বয়ং তাঁহাকে নিম্নোক্ত প্রশ্নটি করিলেন, এবং শাকল্য উত্তর দিতে না পারিলে সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রতি ভীষণ মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করিলেন—

‘য এষাঃ নেতি নেত্যাভ্যা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে, অশীর্ষ্যো ন হি শীর্ষ্যতে, অসঙ্গো ন হি সজ্যতে, অসিতো ন ব্যথতে, ন রিয্যতি……তং ছৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি, তঞ্জে নৈ ন বিবক্ষ্যসি, মূর্খা তে বিপতিয্যতি ইতি’।

অর্থাৎ প্রাণাদি সমগ্র বিশ্ব যাহাতে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে, এবং পূর্বের (মধুকণ্ড নামক প্রকরণে) যাহাকে ‘নেতি নেতি’ বলিয়া নিষেধ-মুখে বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনিই সকলের একমাত্র আশ্রয়—তাহাই আমার প্রতিপাদ্য এবং তিনিই আত্মা। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না বলিয়া তিনি অগ্রাহ্য, শীর্ণ হন না বলিয়া অশীর্ষ্য, কাহারও সহিত সম্বন্ধ হন না বলিয়া অসঙ্গ, নিরবয়ব বলিয়া কোন বস্তুদ্বারা ব্যথিত হন না, বিনষ্টও হন না। যিনি সকলের অতীত, আমি তোমাকে সেই একমাত্র উপনিষদবেত্তা পুরুষসম্বন্ধে,—অর্থাৎ যাহাকে উপনিষৎ-প্রমাণ ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে জানা যায় না, সেই পুরুষ সম্বন্ধে,—জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি তুমি তৎসম্বন্ধে আমাকে উত্তমরূপে বলিতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক দেহ হইতে বিলগ্ন হইয়া নিপতিত হইবে।

শ্রুতি জানাইতেছেন—

‘^{তুং} হ ন মেনে শাকল্যস্তস্য হ মূর্খা বিপশন্ত, ^{মঃ}
অপি হ্যস্ম্য পরিমোষিণোহস্বীকৃত্য জহুরন্যন্যমানাঃ’।
অর্থাৎ শাকল্য সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষের তত্ত্ব অবগত
ছিলেন না। তিনি প্রশ্নের মর্ম্মই বুঝিতে পারিলেন না। ফলে
তঁাহার মস্তক খসিয়া পড়িল। তঁাহার শিষ্যেরা অগ্নিসংস্কারের
জন্ত শাকল্যের অস্থিগুলি বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।
পথে তত্ত্বরগণ ‘ইহা আর কিছু (অর্থাৎ ধনরত্নাদি) হইবে’—
এইরূপ মনে করিয়া সেই অস্থিগুলি অপহরণ করিল। সেই
শাস্ত্র-রণস্থলে যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী গার্গীরও মুণ্ডপাত
‘হব হব’ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অল্পে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সে
কথা পরে বলিতেছি।

কংসকে দমন করিবার জন্ত কৃষ্ণ-বলরাম বৃন্দাবন হইতে
আসিয়া মথুরা নগরীতে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজপথ দিয়া
চলিতে চলিতে নগরীর শোভা ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্মিত
হইলেন। কিন্তু তখনও তঁাহাদের রাখাল-বেশ। এত বড়
রাজধানীর রাজাকে যঁাহারা দমন করিবেন, তঁাহাদের রাখাল-
বেশ থাকিলে চলিবে কেন? পথে দেখিলেন এক রজক বহু
মহার্ঘ বস্ত্র পরিষ্কার করিয়া লইয়া যাইতেছে। তঁাহারা রজকের
নিকট আবশ্যকীয় বস্ত্র চাহিলেন। রজক এই অন্তায় অনুরোধ
উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। কৃষ্ণ-বলরাম ছাড়িলেন
না। রজক বলিল—‘তোমরা কি মূর্খ! এ যে রাজা কংসের

বস্ত্র, আমি রাজবাটীতে লইয়া যাইতেছি। তোমরা রাজার বস্ত্র চাও কোন্ সাহসে? আমি কিছুতেই কাপড় দিতে পারিব না। কৃষ্ণ ভাবিলেন এইখানেই কংস দমনের সূত্রপাত করিতে হইবে। তিনি বিনা অস্ত্রে, শুধু হাত দিয়া রজকের মস্তকটি কাটিয়া ফেলিলেন, এবং রাজার বস্ত্র পরিয়া রাজবেশ ধারণ করিলেন। কথক মহাশয়েরা ইহার উপর একটু রং চড়াইয়া থাকেন। জনবহুল রাজধানীর রাস্তার লোকেরা এই অবাক্ কাণ্ড দেখিয়া মহা সোরগোল আরম্ভ করিল। একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল—সকলের মুখে কেবল ‘হাতে মাথা কাটা’ এই রব। বহু লোকের প্রশ্নোত্তরে শেষে আর অত কথাও যোগাইল না—সহরময় কেবল ‘হা-মা-কা’ ‘হা-মা-কা’ এই শব্দ হইতে লাগিল।

হাত দিয়া মাথা কাটা একটা অদ্ভুত কাণ্ড বৈ কি? কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য একটি কথাদ্বারাই শাকল্যের মুণ্ডপাত করিলেন, ইহা আরও অদ্ভুত কাণ্ড নয় কি? যাজ্ঞ হউক, ভাষাকার আচার্য্য শঙ্কর এই ব্যাপারটিকে একেবারে আক্ষরিক ভাবে নিতে বলেন না। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, ইহা একটি আখ্যায়িকা মাত্র। এই আখ্যায়িকা দ্বারা এই উপদেশ দেওয়া হইল যে, কেহ যেন ‘উপবাদী’ না হয়—অর্থাৎ অন্যকে, বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে পরাভব করিবার দুরাগ্রহ না করে, কিন্তু তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীর অনুবর্ত্তী হইয়াই চলে। তাহা না করিলে পূজ্য-পূজ্য ব্যতিক্রম করিবার ফলে ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট হয়। শাকল্যের মস্তকপাতে ইহকালে অপযশ, এবং মৃতদেহের অগ্নিসংস্কার না

হওয়ায় পরকালেও অধোগতি সূচিত হইল। আখ্যায়িকার অবতারণা করিবার প্রয়োজন কি? কেবল তত্ত্বকথা বলিলেই ত' হয়। প্রয়োজন আছে। ভাষ্যকার প্রকরণ-প্রারম্ভেই, এবং অন্ততঃ একাধিক স্থলে বলিয়াছেন যে আখ্যায়িকা-অবলম্বনে অর্থাৎ গল্পচ্ছলে তত্ত্ববিচার দ্বারা অনেক দুর্বোধ্য বিষয়ও সুগম হয়, আখ্যায়িক তত্ত্ব দৃষ্টান্তাদি দ্বারা বুঝাইলে জিজ্ঞাসু ইহা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে। আখ্যায়িকা দ্বারা ব্রহ্মবিচার প্রশংসাও সিদ্ধ হয়। অতএব আখ্যায়িকা ব্রহ্মবিদ্যাভ্যাসের অন্যতম উপায়। বর্তমান যাজ্ঞবল্ক্যীয় প্রকরণে বিদ্যাভ্যাসের আর একটি উপায় যে দান, তাহা আখ্যায়িকার মধ্যেই জনকের প্রভূত স্বর্ণ ও গোসহস্র দানের দ্বারা প্রদর্শিত হইল। ব্রহ্মবিদ্যাভ্যাসের আরও যে একটি উপায় প্রদর্শিত হইল, তাহা ভাষ্যকারের ভাষায় 'তদ্বিদ্ধ্য সংযোগঃ'। তিনি বলেন--

‘সমবিদ্যাব্যবসায়ীদের একত্র সমাবেশকে তদ্বিদ্ধ্যসংযোগ বলে। তাঁহাদের সহিত বিচারদ্বারা সহজে সিদ্ধান্ত নিরূপণ হইতে পারে বলিয়া ইহাও বিদ্যাভ্যাসের একটি উপায়। এই প্রকরণে ইহা প্রকৃষ্ট পরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিদ্বৎসংযোগে যে জ্ঞানবৃদ্ধি হয় ইহা, প্রত্যক্ষসিদ্ধও বটে। অতএব বুঝা উচিত যে এই আখ্যায়িকার অবতারণার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে বিদ্যাপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শন।’

প্রসঙ্গক্রমে শাকল্যসহ যাজ্ঞবল্ক্যের শাস্ত্রবিচারের উল্লেখ করা হইল মাত্র। শাকল্যের সহিত, বা অশ্বলাদি অন্য সাত

জনের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বিচারের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এস্থলে উদ্দেশ্য নহে। আমরা ব্রহ্মবিদ্যুদী গার্গীর কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাঁহার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের যে প্রশ্নোত্তর সংবাদ হইয়াছিল তাহা বলিতেছি। প্রশ্নকর্তাদিগের মধ্যে গার্গীকে আমরা প্রথমতঃ যষ্ঠ স্থানে দেখিতে পাই। তাঁহার পূর্ববর্তী পাঁচ জনের কেহই যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করিতে না পারিয়া শেষে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। তখন গার্গী শাস্ত্রযুদ্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখীন হইয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। সেই সকল প্রশ্ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর নিম্নোক্ত ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

গার্গী। হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমগ্র পৃথিবীমণ্ডল অন্তর বাহিরে জলদ্বারা ওতপ্রোত, অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—এই জলরাশি আবার ওতপ্রোতভাবে কোথায় আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য। বায়ুতে।

তৎপর প্রশ্নোত্তর এইরূপ—

বায়ুমণ্ডল আবার কোথায় ওতপ্রোতভাবে আছে ? অন্তরীক্ষ লোকে। অন্তরীক্ষ লোক কোথায় ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে ? গন্ধর্ব্বলোকে। গন্ধর্ব্বলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে ? আদিত্যলোকে। আদিত্যলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে ? চন্দ্রলোকে। চন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে ? নক্ষত্রলোকে। নক্ষত্রলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে ? দেবলোকে। দেবলোক

কোথায় ওতপ্রোত আছে ? ইন্দ্রলোকে । ইন্দ্রলোক কোথায়
ওতপ্রোত আছে ? প্রজাপতি-লোকে । প্রজাপতি-লোক
কোথায় ওতপ্রোত আছে ? ব্রহ্মলোকে । ব্রহ্মলোক কোথায়
ওতপ্রোত আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য । হে গার্গী, তুমি প্রশ্ন করিবার নীতি অতিক্রম
করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিও না । ঐরূপ নীতিবিরুদ্ধ প্রশ্ন
করিবার ফলে তোমার মাথা খসিয়া পড়িবে । গার্গী, যে দেবতা
একমাত্র আগমগম্য (অর্থাৎ শাস্ত্র ভিন্ন প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি কোন
প্রমাণ দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না), তৎসম্বন্ধে অনুমানের প্রণালী
অবলম্বন করিয়া প্রশ্ন করিলে তাহা 'অনতিপ্রশ্ন্য' (প্রশ্নের
অবিষয় বা অযোগ্য) হয় । তুমি ঐরূপ অযোগ্য প্রশ্ন
হইতে বিরত হও ।

এই কথা শুনিয়া গার্গী ভীত বা স্তম্ভিত হইয়াছি
কৃত্তিতে তাহা উক্ত নাই, কিন্তু ভাষ্যকার বলিয়
শিরঃপতন ভয়ে এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিলেন
মস্তক অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেল ।

এই প্রশ্নোত্তরসমূহের তাৎপর্য,--গার্গীর পূর্ববর্তী প্রশ্ন-
প্রশ্নকর্তা কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যাঁহাকে
সাক্ষাৎ (ব্যবধান-রহিত) অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষসিদ্ধ) ব্রহ্ম বলা
হয়, এবং যিনি দেহাদি সমস্ত পদার্থের অন্তরে অবস্থিত আত্মা,
তাঁহার স্বরূপ কি ? চতুর্থ প্রশ্নকর্তা উষস্ত পূর্বে ইহা এই
প্রশ্নটিই করিয়াছিলেন । তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, যিনি

জনের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বিচারের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এস্থলে উদ্দেশ্য নহে। আমরা ব্রহ্মবিদ্যার গার্গীর কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাঁহার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের যে প্রশ্নোত্তর সংবাদ হইয়াছিল তাহা বলিতেছি। প্রশ্নকর্তাদিগের মধ্যে গার্গীকে আমরা প্রথমতঃ যষ্ঠ স্থানে দেখিতে পাই। তাঁহার পূর্ববর্তী পাঁচ জনের কেহই যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করিতে না পারিয়া শেষে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। তখন গার্গী শাস্ত্রযুদ্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখীন হইয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। সেই সকল প্রশ্ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর নিম্নোক্ত ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

গার্গী। হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমগ্র পৃথিবীমণ্ডল অন্তর বাহিরে জলদ্বারা ওতপ্রোত, অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—এই জলরাশি আবার ওতপ্রোতভাবে কোথায় আছে?

যাজ্ঞবল্ক্য। বায়ুতে।

তৎপর প্রশ্নোত্তর এইরূপ—

বায়ুমণ্ডল আবার কোথায় ওতপ্রোতভাবে আছে? অন্তরীক্ষ লোকে। অন্তরীক্ষ লোক কোথায় ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে? গন্ধর্ব্বলোকে। গন্ধর্ব্বলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? আদিত্যালোকে। আদিত্যালোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? চন্দ্রলোকে। চন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? নক্ষত্রলোকে। নক্ষত্রলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? দেবলোকে। দেবলোক

কোথায় ওতপ্রোত আছে ? ইন্দ্রলোকে । ইন্দ্রলোক কোথায়
ওতপ্রোত আছে ? প্রজাপতি-লোকে । প্রজাপতি-লোক
কোথায় ওতপ্রোত আছে ? ব্রহ্মলোকে । ব্রহ্মলোক কোথায়
ওতপ্রোত আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য । হে গার্গি, তুমি প্রশ্ন করিবার নীতি অতিক্রম
করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিও না । ঐরূপ নীতিবিরুদ্ধ প্রশ্ন
করিবার ফলে তোমার মাথা খসিয়া পড়িবে । গার্গি, যে দেবতা
একমাত্র আগমগম্য (অর্থাৎ শাস্ত্র ভিন্ন প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি কোন
প্রমাণ দ্বারা যাহাকে জানা যায় না), তৎসম্বন্ধে অনুমানের প্রণালী
অবলম্বন করিয়া প্রশ্ন করিলে তাহা 'অনতিপ্রশ্ন্য' (প্রশ্নের
অবিষয় বা অযোগ্য) হয় । তুমি ঐরূপ অযোগ্য প্রশ্ন
হইতে বিরত হও ।

এই কথা শুনিয়া গার্গী ভীত বা স্তম্ভিত হইয়াছিল^{যে, অত}
কৃত্তিতে তাহা উক্ত নাই, কিন্তু ভাষ্যকার বলিয়^{প্রশ্ন ভিন্ন}
শিরঃপতন ভয়ে এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিলেন^{ব্লেথ করা} ।
যাহা^ন
মস্তক অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেল ।

এই প্রশ্নোত্তরসমূহের তাৎপর্য,--গার্গীর পূর্ববর্তী পক্ষ^ন
প্রশ্নকর্তা কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যাহাকে
সাক্ষাৎ (ব্যবধান-রহিত) অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষসিদ্ধ) ব্রহ্ম বলা
হয়, এবং যিনি দেহাদি সমস্ত পদার্থের অন্তরে অবস্থিত আত্মা,
তাহার স্বরূপ কি ? চতুর্থ প্রশ্নকর্তা উষস্ত পূর্বের ঠিক এই
প্রশ্নটিই করিয়াছিলেন । তদন্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, যিনি

প্রাণ অপানাদি দেহস্থ পঞ্চবায়ু দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য করেন, তিনিই সর্বান্তর আত্মা। কারণ, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রাণাদি নিজ নিজ কার্য করিতে পারে না। উষন্ত এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না, এবং যাজ্ঞবল্ক্য একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অন্তরূপ উপদেশ দিতেছেন মনে করিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিলেন। কারণ উষন্তের মতে উহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু বলিলেন—তঁাহার উত্তর ঠিকই হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত ব্রহ্মের স্বরূপ কিছু বলা যায় না। ঘটাতির ন্যায় তঁাহাকে প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করা যায় না। অতএব ‘ন দৃষ্টে দ্র’ষ্টারং পশ্যৎ’ দৃষ্টির দৃষ্টাকে গাংগা-চেষ্টা করিও না। ইত্যাদি কহোলের প্রশ্নের উত্তরে বাহিরে জলদ্বন্দ্বক্ষেপে বলিয়াছিলেন—যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, তোমাকে জিভাও মৃত্যুর অতীত, তিনিই সর্বান্তরে অবস্থিত আত্মা কোথায় আছে আত্মাকে জানিতে পারেন, সেই ব্রহ্মবিৎ সর্বপ্রকার যাজ্ঞবল্ক্যের কামনা হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং পরবৈরাগ্যযুক্ত তপ্ত গৰ্ব্বত্যাগরূপ ‘ভিক্ষার্চ্য’ অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। সন্ন্যাসিনী গার্গী এই প্রশ্নোত্তরের সূত্রটি গ্রহণ করিয়া কহোলের পর স্বয়ং অগ্রবর্তী হইয়া যে সকল প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা সেই সর্বান্তর আত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ষষ্ঠ ব্রাহ্মণোক্ত গার্গীর প্রশ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া নবম ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যীয় কাণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত সেই সর্বান্তর আত্মার স্বরূপ নিরূপণেই

পূর্ণাবসিত। অতএব গার্গীকেই সর্বান্তর আত্মস্বরূপ নির্ণয়ের
 প্রবর্তনা বলা যাইতে পারে। যেক্রমে গার্গীর প্রশ্নে সর্বান্তর
 আত্মর যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, এবং যে প্রশ্নোত্তরে
 গার্গীর প্রশ্নগুলি উত্তরিত হইয়াছে তাহাতেই ইহা প্রদর্শিত
 হইয়াছে। পৃথিবী জলে ওতপ্রোত। জল কোথায় ওতপ্রোত ?
 বায়ুতে। বায়ু কোথায় ওতপ্রোত ?—ইত্যাদিরূপ প্রশ্নোত্তরের
 মধ্যে নিহিত তত্ত্বটাই এই যে, যাহা কার্য্য তাহা কারণ দ্বারা ব্যাপ্ত
 থাকে, যাহা সূক্ষ্ম তাহা সূক্ষ্ম দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে। পৃথিবী জল
 হইতে উৎপন্ন; অতএব পৃথিবী কার্য্য, জল কারণ। সেইরূপ
 জল অগ্নি হইতে, অগ্নি বায়ু হইতে উৎপন্ন ইত্যাদি। শ্রুতিতে
 যে জনকে বায়ুতে ওতপ্রোত বলা হইয়াছে, অর্থাৎ অগ্নির যে
 উল্লেখ করা হয় নাই, তৎস্বরূপে ভাষ্যকার বলেন যে, অগ্নি
 ভূতগুলির আয় অগ্নি কখনই কোন পার্থিব বা জলীয় আশ্রয়ভিন্ন
 স্বতন্ত্রভাবে থাকে না; সেইজন্য একবরে বায়ুর উল্লেখ করা
 হইয়াছে—অগ্নির ব্যাপকত্ব পৃথকভাবে বলা হয় নাই। যাহা
 কারণ তাহা কার্য্য হইতে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক হইয়া থাকে। এইরূপে
 পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত একটির পর
 একটির আন্তরহ প্রদর্শন করিয়া যেখানে কারণহ, সূক্ষ্মহ ও
 ব্যাপকহ নিরতিগততা প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাহার পর আর
 কিছু কারণ নাই, আর কিছু সূক্ষ্ম নাই, আর কিছু ব্যাপক নাই,
 তিনিই সর্বকারণ কারণ, ‘নতাস্ত সত্যম্’ সত্যের সত্য, সর্বান্তর
 জ্ঞানস্বরূপ আত্ম। আর একটি কথা লক্ষ্য করিবার এই যে,

পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া জল, অগ্নি, বায়ু অন্তরীক্ষ, গন্ধর্ব্বলোক, স্বর্গলোক, আদিত্যলোক প্রভৃতি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্তই ভৌতিক অর্থাৎ ভূতরচিত—উহাদের মধ্যে কেবল স্থূল-সূক্ষ্মর তারতম্য মাত্র। পৃথিবীর উপাদান অতি স্থূলভূত, ব্রহ্মলোকের উপাদান অতি সূক্ষ্মভূত—এইমাত্র ভেদ। ভৌতিক বলিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্তই পরিচ্ছিন্ন, এবং আপেক্ষিকরূপে একে অণুর ব্যাপক বা কারণ, সূতরাং এই সকলই অনাত্ম, এবং একমাত্র ব্রহ্মই সর্বাত্মর আত্মা।

যাহা হউক, ইহার পর গার্গীকে দ্বিতীয়বার আমরা অষ্টম প্রশ্নকর্ত্রীরূপে দেখিতে পাই। শ্রুতির সংক্ষিপ্ত বিবরণটি অবলম্বন করিয়া ‘আত্মপুরাণ’* নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থে গার্গীর দ্বিতীয়বার শাস্ত্রবিচাররূপ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। ইহাতে তিনি যে ব্রহ্মবিৎ-সমাজে একজন জীবন্মুক্তা ব্রহ্মবিদ্রুপী বলিয়া স্বীকৃতা হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আত্মপুরাণের বর্ণনাকে পূর্বোক্ত শঙ্করাচার্য্য অনুমোদিত আখ্যায়িকারূপে গ্রহণ করিলে কোন দোষ নাই। আখ্যায়িকা প্রকৃত ঘটনামূলক না হইলেও ব্রহ্মবিদ্যাভার উপায়রূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় এতদ্বারা শ্রুতির উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়।

* ‘আত্মপুরাণ’ গীতার প্রসিদ্ধ টীকাকার শঙ্করানন্দ স্বামী রচিত প্রায় ১৩ ভাগের শ্লোকে সমাপ্ত একখানি বিরাট গ্রন্থ। ইহাতে ঐতরেয়, তৈত্তরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, খেতাশ্বতর প্রভৃতি প্রধান প্রধান কয়েকখানি উপনিষদের ব্যাখ্যাচ্ছলে বিস্তৃত বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে।

আত্মপুরাণের বর্ণনা (টীকানুযায়ী) এইরূপ—উদালকের পর বাচক্রবী গার্গী সভাস্থ বেদবিদ ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে বিপ্রগণ, আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। তাহার উত্তর যদি তিনি দিতে পারেন, তবে জানিবেন আপনাদের মধ্যে কেহই এই মহামতি ব্রহ্মবত্তা, খড়্গোত্তমগণের মধ্যে রবিতুল্য প্রকাশমান, যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। অতএব হে দ্বিজোত্তমগণ, আপনারা আমাকে প্রশ্ন করিতে অনুমতি করুন। গার্গী অতীব ধী-শালিনী। তথাপি তাঁহাকে যাজ্ঞবল্ক্য একবার শাপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় হয়ত শাপ দিতে পারেন—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি বারবার ব্রাহ্মণগণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ‘প্রশ্ন কর’ বলিয়া অনুমতি দিয়াছিলেন। অনুমতি লাভ করিয়া গার্গী সেই সভায় যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যেনন সর্বত্র প্রশিক্ষিত, আমি বাচক্রবী গার্গীও প্রশিক্ষিত। পুরুষাপেক্ষা নারীদের বুদ্ধির আধিক্যও প্রশিক্ষিত (‘বুদ্ধিচ্চাসাং চতুর্গুণঃ’—এই শাস্ত্রে ক্তি আছে)। অবিবেক (সাহস), কাম (রাগ), ধৈর্য ও ক্রোধ—এই চারটিও পুরুষাপেক্ষা নারীতে অধিক। ঐদৃশী জ্ঞানগণের মধ্যে বুদ্ধিবিষয়ে আমাকে প্রথম গণনীয় বলিয়া জানিবেন। কেননা আমি সরস্বতীতুল্য ধীমতী। হে বিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য, আমি এই সমস্ত জগৎটাকে পুরুষের ভাব ও কর্মগত বলিয়া মনে

পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া জল, অগ্নি, বায়ু অন্তরীক্ষ, গন্ধর্বলোক, স্বর্গলোক, আদিত্যলোক প্রভৃতি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্তই ভৌতিক অর্থাৎ ভূতরচিত—উহাদের মধ্যে কেবল স্থূল-সূক্ষ্মর তারতম্য মাত্র। পৃথিবীর উপাদান অতি স্থূলভূত, ব্রহ্মলোকের উপাদান অতি সূক্ষ্মভূত—এইমাত্র ভেদ। ভৌতিক বলিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্তই পরিচ্ছিন্ন, এবং আপেক্ষিকরূপে একে অন্তের ব্যাপক বা কারণ, সুতরাং এই সকলই অনাত্ম, এবং একমাত্র ব্রহ্মই সর্বাস্তুর আত্মা।

যাহা হউক, ইহার পর গার্গীকে দ্বিতীয়বার আমরা অষ্টম প্রশ্নকর্ত্রীরূপে দেখিতে পাই। ঋতুর সংক্ষিপ্ত বিবরণটি অবলম্বন করিয়া ‘আত্মপুরাণ’* নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থে গার্গীর দ্বিতীয়বার শাস্ত্রবিচাররূপ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। ইহাতে তিনি যে ব্রহ্মবিৎ-সমাজে একজন জীবনমুক্তা ব্রহ্মবিদ্বদ্বী বলিয়া স্বীকৃতা হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আত্মপুরাণের বর্ণনাকে পূর্বেবক্ত শঙ্করাচার্য্য অনুমোদিত আখ্যায়িকারূপে গ্রহণ করিলে কোন দোষ নাই। আখ্যায়িকা প্রকৃত ঘটনামূলক না হইলেও ব্রহ্মবিদ্যালোভের উপায়রূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় এতদ্বারা ঋতুর উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়।

* ‘আত্মপুরাণ’ গীতার প্রসিদ্ধ টীকাকার শঙ্করানন্দ স্বামী রচিত প্রায় ১৩ হাজার শ্লোকে সমাপ্ত একখানি বিরাট গ্রন্থ। ইহাতে ঐতরেয়, তৈত্তরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, খেতাশ্বতর প্রভৃতি প্রধান প্রধান কয়েকখানি উপনিষদের ব্যাখ্যাচ্ছলে বিস্তৃত বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে।

আত্মপুরাণের বর্ণনা (টীকানুযায়ী) এইরূপ—উদালকের পর বাচক্রবী গার্গী সভাস্থ বেদবিদ্ব ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে বিপ্রগণ, আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। তাহার উত্তর যদি তিনি দিতে পারেন, তবে জানিবেন আপনাদের মধ্যে কেহই এই মহামতি ব্রহ্মবত্তা, খ্যাতগণের মধ্যে রবিতুল্য প্রকাশমান, যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। অতএব হে দ্বিজোত্তমগণ, আপনারা আমাকে প্রশ্ন করিতে অনুমতি করুন। গার্গী অতীব ধী-শালিনী। তথাপি তাঁহাকে যাজ্ঞবল্ক্য একবার শাপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় হয়ত শাপ দিতে পারেন—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি বারবার ব্রাহ্মণগণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ‘প্রশ্ন কর’ বলিয়া অনুমতি দিয়াছিলেন। অনুমতি লাভ করিয়া গার্গী সেই সভায় যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যেমন সর্বত্র প্রশিক্ষিত, আমি বাচক্রবী গার্গীও তেমনি প্রশিক্ষিত। পুরুষাপেক্ষা নারীদিগের বুদ্ধির আধিক্যও প্রশিক্ষিত (‘বুদ্ধিশ্চাসাং চতুর্গুণঃ’—এই শাস্ত্রে ‘ক্তি আছে)। অবিবেক (সাহস), কাম (রাগ), ধৈর্য ও ক্রোধ—এই চারিটিও পুরুষাপেক্ষা নারীতে অধিক। ঈদৃশী জ্ঞানগণের মধ্যে বুদ্ধিবিষয়ে আমাকে প্রথম গণনীয় বলিয়া জানিবেন। কেননা আমি সরস্বতীতুল্যা ধীমতী। হে বিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য, আমি এই সমস্ত জগৎটাকে পুরুষের ভাব ও কর্মহীন বলিয়া মনে

করি। সৰ্ব্বাশ্ৰবাই পৌরুষ। আমি স্ত্রী, আমি নপুংসক, আমি পুরুষ, জগতের লোকদের মধ্যে এইরূপ ভেদদৃষ্টি আছে বলিয়া জগৎকে আমি অপৌরুষ মনে করি। হৃদিস্থিত স্বপ্রকাশ, আনন্দরূপ, অব্যয় আত্মপুরুষকে যে জানে না, সেই পুরুষই নপুংসক বা নারীত্বলা, পীনপয়োধরা বলিয়া আমি নারী নহি। * কেননা স্ত্রী-বশীভূত পুরুষের আয় সেই অজ্ঞানী আত্মাভিন্ন অন্তের বশীভূত বলিয়া নারীত্বলা। সেই অজ্ঞ পুরুষেরা স্ত্রীদিগের মধ্যেও আবার বারাদ্ভিন্নত্বলা। কারণ তাহারা, বেশ্যাগামী কর্তৃক বেশ্যার আয়, কাম ক্রোধান্দির ভোগ্য হয়। আমি সেইরূপ অজ্ঞ পুরুষ নহি। গর্ভধারণবিষয়েও অজ্ঞ পুরুষ স্ত্রীত্বলা। কেননা, সপ্তমধাতু যে রেতঃ, তাহা গর্ভরূপে পুরুষেই প্রথমতঃ থাকে। ঐ গর্ভই সেই অজ্ঞ পুরুষ রূপা স্ত্রী কালরূপ পুরুষ দ্বারা সংযুক্ত হইয়া স্ত্রী-শরীরে নিষিক্ত করে। অতএব পুরুষসহযোগে নারীরা যেমন গর্ভধারণ করে, অজ্ঞপুরুষও সেইরূপ রেতরূপ প্রথম গর্ভধারণ করিয়া থাকে।†

* ইহা ঋগ্বেদ সংহিতার এই মন্ত্যংশটির প্রাতিধ্বনি—ওঁ দ্বিঃ সত্যীস্তাঃ উমে পুংসঃ আহঃ (১।১৬৪।১৬) অর্থাৎ ব্রহ্মবিদগণ বলেন তত্ত্বদর্শিনী নারী পুরুষই। সূতরাং পুরুষ অজ্ঞানী হইলে নারীই।

† এ বিষয়ে প্রমাণ ঐতরেয় শ্রুতি, যথা—‘পুরুষেহবা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি যদেতদ্রেতঃ’ ইত্যাদি (২।১।১) অর্থাৎ কস্মাভিমানী পুরুষ চন্দ্রমণ্ডলপ্রাপ্ত হইয়া কস্মাক্ষয়ে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমতঃ পুরুষদেহে গর্ভরূপী হয়। সেই গর্ভ হইতেছে যাহা রেতঃ (শুক্র) নামে প্রসিদ্ধ তাহাই।

রূপ ও ছঃসহ যৌবনসংযুক্ত এই বয়সে আমি যুবকদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়াও অবিকৃতচিত্তা। আমি নগ্না, এবং আপনাদের মধ্যে থাকিয়াও মনে কার—একান্ত নির্জ্ঞান স্থানে রহিয়াছি। বরং এই বেদবিদ ব্রাহ্মণরাই চিত্তবিকার ভয়ে ভীত হইয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। আমি কিন্তু দ্বিজ সকলকে দেখিতেছি, করদ্বারা স্পর্শও করিতেছি। যে ধারণ করে (স্ত্যায়তে—ধারণ করে, যেমন নারী সংহত শুক্র-শোণিত ধারণ করে), তাহার নাম স্ত্রী ('স্ত্য' ধাতু 'ড্রট্' প্রত্যয়)। আমি চিত্তব্রহ্মচারিণী বলিয়া উক্তবিধা নহি, অতএব আমাকে কিরূপে বধু অর্থাৎ স্ত্রী বলা যাইতে পারে? পণ্ডিতগণ ('স্ত্য' ধাতুর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ) 'স্ত্যায়তে' শব্দের এইরূপ নানা ভাবসম্পন্ন অর্থও করেন, যথা—আমি উত্তমা বধু, যুবতী, সুস্বামী, কামিনী, আমার সমান নীতিম্বিনী আর কে আছে, অমুক অমুক আমার পতি, পুত্র কন্যা, আমার গৃহে ধন-ধান্য আছে, আমি বক্ষ্যা, আমি কুটুম্বিনী—ইত্যাদি শব্দ সংঘাত। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, পিশাচী মায়ার সহিত সম্বন্ধহেতু আত্মবোধশূন্য যে সকল ব্যক্তিতে ঐরূপ শব্দসংঘাত-লক্ষিত ভাব বর্তমান থাকে (পুরুষ হইলেও) তাহারাই স্ত্রী। আত্মবোধ দ্বারা যাহারা পূর্ণ, (স্ত্রী হইলেও), তাহারাই পুরুষ। শরীরসম্পর্কহেতু তাহার পুরুষ বা স্ত্রী যাহাই কেন হউক না, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। যেমন নট এইক্ষণে নারীমনোহর পুরুষরূপে অভিনয় করিল পরক্ষণেই আবার পুরুষধৈর্য্যবিনাশিনী স্ত্রীরূপে আসিয়া দেখা দিল। সেইরূপ একই

আনন্দাত্মা মহেশ্বররূপ পুরুষই স্বেচ্ছায় পুরুষ বা স্ত্রীরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকেন। পুরুষ, স্ত্রী, হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি যে ভেদ জাগ্রৎকালে জগতে দৃষ্ট হয় তাহা মায়া দ্বারা কল্পিত,—যেমন স্বপ্নে একই পুরুষ নানারূপ ধারণ করে। ললনাদেহে বর্তমানা, আত্মবোধরূপ পৌরুষনঃযুক্তা বলিয়া সর্বজ্ঞা আমি গাঙ্গী বাগিন্দ্রিয়রূপ ধনুতে ছুইটি প্রশ্নরূপ বাণ যোজনা করিয়া সর্বপণ্ডিতবিজ্ঞতা সর্বজ্ঞাভিমানী তোমাকে (যাজ্ঞবল্ক্যকে) এই শাস্ত্র-সংগ্রামে বধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলাম। হয় তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধ কর, নহুবা আমার নিকট অবনতি স্বীকার কর।... যদি তুমি আমার প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিতে সক্ষম হও, তবে উত্তর দাও।

গাঙ্গীর কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গাঙ্গি, তোমার কি প্রশ্ন তাহা বল। তখন গাঙ্গী যে প্রশ্ন করিলেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্য তাহার যে উত্তর দিলেন, তাহা আমরা এক্ষণ পুনরাবৃত্তি করিয়া শুভিবাচ্য অনুসরণ করিয়া নিম্নে প্রদান করিতেছি। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গাঙ্গী প্রথমেই উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে বলিয়াছিলেন, 'যাজ্ঞবল্ক্য যদি আমার প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন—আপনাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না।' তারপর ব্রাহ্মণদের অনুমতি লাভান্তে গাঙ্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

'হে যাজ্ঞবল্ক্য, বেদান্তপণ্ডিতগণ যে সূত্রাত্মকে ছ্যালোকের

(স্বর্গের) উপরে, পৃথিবীর নিম্নে, ছ্যালোক ও পৃথিবীর মধ্যভাগে, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তিনকালই বর্তমান আছেন বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই সূত্রানুযায়ী, পৃথিবী যেমন জলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে আছে, সেইরূপ কোথায় ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন ?

প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে,— ছ্যালোক, ভূলোক, অম্বরীক্ষ ইত্যাদি সমস্ত দ্বৈতজগৎ যাহাদ্বারা ব্যাপ্ত তিনিই সূত্রানুযায়ী— যাহাকে গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন ‘মস্মি সর্দ্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব’— সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ জগৎ আমাতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। সেইরূপ এ স্থলেও দ্বৈতজগৎকে, ব্যক্ত জগৎকে; লক্ষ্য করিয়া এই প্রশ্ন করা হইল যে, এই ব্যক্তজগৎরূপী সূত্রানুযায়ী কোথায় ওতপ্রোত আছেন ?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন—

হে গার্গি, তোমার কথিত সূত্রানুযায়ী আকাশে ওতপ্রোতভাবে স্থিত আছেন। অর্থাৎ এই অভিব্যক্ত স্থূল জগৎরূপ সূত্রানুযায়ী অনভিব্যক্ত সূক্ষ্ম আকাশে উৎপত্তি-স্থিতি-লয় অর্থাৎ অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ তিন কালেই অবস্থান করিতেছেন। নিরূপাধিক অপরোক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিবার জন্য এই প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেইজন্য স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা হইতেছে; পরে যে প্রশ্নোত্তর আছে, তাহাতে ইহা সুস্পষ্ট।

গার্গী তাঁহার প্রশ্নের সঠিক উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ সাধারণতঃ লোকের পক্ষে সূত্রতত্ত্বও দুর্বিজ্ঞ। সেই সূত্র আবার কাহাতে অবস্থিত—এই তত্ত্ব আরও দুর্বিজ্ঞ। তিনি বলিলেন, ‘হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যে আমার প্রশ্নের এইরূপ যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছ, তজ্জন্ত তোমাকে আমার নমস্কার। এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্ত অবিচলিতভাবে অবস্থান কর, অর্থাৎ মনোনিবেশ কর।’ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—জিজ্ঞাসা কর।

গার্গী প্রশ্ন করিলেন ‘আচ্ছা, সেই সূক্ষ্ম আকাশ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে আছে?’

এই প্রশ্নবারা গার্গী মনে করিলেন—এক মহা সমস্যাৱ সৃষ্টি করা হইল, যাহার সমাধান করা যাজ্ঞবল্ক্যের পক্ষে অসম্ভব হইবে। কারণ, সহজ বুদ্ধিতে আকাশতত্ত্ব নিরূপণ করাই মুকঠিন, সেই আকাশ আবার ক্ষেণবস্তুরূপে অবস্থিত ইহা একরূপ দুঃস্বপ্ন। অ্যায়ণাশ্রায়ুবারে যে কথার উত্তর চলে না, তাহাকে অগ্রতন নিগ্রহস্থান বলা হয়। অতএব যাজ্ঞবল্ক্য এইখানেই ঠেকিয়া যাইবেন, গার্গীর ইহাই মনে হইয়াছিল। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের সূক্ষ্মগ্রাহী বুদ্ধির নিকট কিছুই দুর্নিরূপ নহে। তিনি উত্তর দিলেন—

হে গার্গী, ব্রহ্মবিদগণ আকাশের আধারকে ‘অক্ষর’ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ‘অক্ষর’ অর্থে যাহা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, বা পরিবর্তিত হয় না, বিকারপ্রাপ্ত হয় না—নাম অরায়, অচল, ধ্রুব, শাস্বত। সেই অক্ষর বস্তুকে কিরূপে জানা যায়?

এইরূপ প্রশ্নের সম্ভাবনায় যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন যে, 'তিনি ইহা নন', 'তিনি উহা নন' এইরূপ 'নেতি' 'নেতি' ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ করা যায় না। যথা—তিনি 'অস্থূল'—স্থূল হইতে ভিন্ন, 'অনণু'—সূক্ষ্মতম বস্তু হইতেও ভিন্ন, 'অহ্রস্ব'—যে কোন ক্ষুদ্রায়তন বস্তু হইতেও ভিন্ন, 'অদীর্ঘ'—দীর্ঘ বস্তু হইতে ভিন্ন। কোন বস্তু হয় স্থূল, নয়ত অণু, নয়ত হ্রস্ব, নয়ত দীর্ঘ—একটা কিছু হইবে, কিন্তু 'অক্ষর' ইহার কিছুই নহেন। দ্রব্য না হউন, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন কোন একটা গুণ হউন। না, তাহাও নহে। কেননা তিনি 'অলোহিত'—লোহিত (যেমন অগ্নি) নহেন; 'অস্নেহ'—স্নেহগুণযুক্ত (যেমন জল) নহেন; তিনি 'অচ্ছায়'—ছায়া হইতে ভিন্ন; 'অতমঃ'—অন্ধকার হইতে ভিন্ন, 'অবায়ু'—বায়ু হইতে ভিন্ন; 'অনাকাশ'—আকাশ হইতে ভিন্ন; 'অসঙ্গ'—সঙ্গাত্মক (অন্য বস্তুসহ মিলিত হইবার যোগ্য) বস্তু হইতে ভিন্ন, 'অরস'—সর্বরস হইতে ভিন্ন; 'অগন্ধ'—সর্বগন্ধ হইতে ভিন্ন; 'অচক্ষু'—চক্ষু হইতে ভিন্ন; 'অশ্রোত্র'—কর্ণ হইতে ভিন্ন; 'অবাক্'—বাগিন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন; 'অমনঃ'—মন হইতে ভিন্ন; 'অতেজঃ'—তেজ হইতে ভিন্ন; 'অপ্রাণ'—শরীরস্থ প্রাণবায়ু হইতে ভিন্ন; 'অমুখ'—মুখদ্বার হইতে ভিন্ন; 'অমাত্র'—সর্ব পরিমাপক বস্তু (যাহা দ্বারা অন্য বস্তু পরিমিত করা যায়) হইতে ভিন্ন। সেই অক্ষর বস্তু 'অনন্তর'—ছিদ্রবৎ বস্তুর ন্যায় তাঁহার অন্তর (মধ্য) বলিয়া কিছু নাই; অবাহু

—তঁাহার বাহ্য বলিয়া কিছু নাই। সেই অক্ষর কিছু ভক্ষণ করেন না, তঁাহাকেও কেহ ভক্ষণ করে না। তাৎপর্য্য এই যে, সেই অক্ষর বস্তু সর্ববিশেষণরহিত—তিনি এক অদ্বিতীয়, কোন গুণদ্বারা বা কোন প্রকারেই বিশেষিত হইতে পারে না।

কার্য্য দ্বারা কারণের অনুমান করা যায়। জগদ্ব্যাপার যেরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলিতেছে—ইহা অনুধাবন করিয়া সহজেই বুঝা যায় ইহার এমন কোন নিয়ন্তা আছেন যঁাহার শাসন চন্দ্র-সূর্য্য ইত্যাদি কেহই, বা দেব-মানবাদি কোন জীবই লঙ্ঘন করিতে পারে না। সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে যদি কাহারও সেই ‘অক্ষর’ সম্বন্ধে সংশয় হয়, সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য এক্ষণ উক্ত প্রকার কার্যালিঙ্গক অনুমান অবলম্বন করিয়া তঁাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছেন—

হে গার্গি, যেমন একটি প্রদীপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিৰ্ম্মিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াই আলোকপ্রদানরূপ প্রয়োজন সাধন করিতে পারে, সেইরূপ এই লোকপ্রদীপস্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র সেই অক্ষর পুরুষ কর্তৃক নিৰ্ম্মিত, তঁাহারই সুশাসনে নিয়ন্ত্রিত ও ধৃত হইয়া লোক-প্রয়োজন সাধন করিতেছে। সেই অক্ষর পুরুষের অলঙ্ঘনীয় শাসনে ছালোক (স্বর্গ) ও পৃথিবী গুরুত্বনিবন্ধন পতনশীল হইয়াও বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। হে গার্গি, নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবারাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর কালাবয়বরূপ এই সমস্তই সেই অক্ষরের সুশাসনে নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে। হে গার্গি, সেই অক্ষরের সুশাসনে পূর্ব ও অন্ত্যাদি দিক্-

প্রবাহিণী নদীসকল হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া নিয়মের ব্যতিক্রম না করিয়া, অন্য পথে না চলিয়া, যথানির্দিষ্ট মার্গে গমন করিতেছে। হে গার্গি, সেই অক্ষরের শাসন আছে বলিয়া মনুষ্যেরা দানশীল লোকের, ও দেবতারা যজ্ঞকর্তার প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং পিতৃগণ দব্বী হোমের অনুগত হইয়া থাকেন (অর্থাৎ কর্মফলদাতা কেহ আছেন প্রমাণ দ্বারা ইহা জানিয়াই মনুষ্যেরা পরলোকে উত্তম ফলের আশায় দান-যাগ-যজ্ঞাদি করিয়া থাকে)। হে গার্গি, সেই অক্ষর ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভ না করিয়া কেহ হোম করুক, বা যজ্ঞ করুক, দীর্ঘকালব্যাপী তপস্শ্রম হইউক, তাহাতে তাহার জন্মমরণরূপ সংসারভোগ নিবৃত্ত হইবে না। কারণ, ঐ সকল কর্মের ফল পরিমিত, নাশশীল (ইহা দ্বারাও অক্ষরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল, কারণ এমন একজন আছেন যিনি অনুভবগোচর না হইলে অন্য কোন ক্রিয় দ্বারা মোক্ষ অসম্ভব। ইহা দ্বারা কেবল কর্মদ্বারা যে মুক্তি হয় না তাহাও শ্রুতি প্রদর্শন করিলেন)। হে গার্গি, যে ব্যক্তি সেই অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ না করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, সে 'কুপণ' পদবাচ্য, অর্থাৎ সে ক্রীতদাসের ন্যায় অতি দীন, হতভাগ্য। হে গার্গি, যে ব্যক্তি অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যান, ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া তিনিই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য।

হে গার্গি, সেই অক্ষরসংজ্ঞক ব্রহ্মকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলের দৃষ্টা, কারণ তিনি নিজে দৃষ্টিস্বরূপ। তাঁহাকে

কেহু শ্রবণগোচর করিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলের শ্রোতা, কারণ তিনি নিজে শ্রুতিস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ মনের বিষয় করিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলের মন্তা, কারণ তিনি নিজে মতিস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ বুদ্ধির গোচর করিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলের বিজ্ঞাতা, কারণ তিনি নিজে জ্ঞানস্বরূপ। এই অক্ষর ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মন্তা নাই, বিজ্ঞাতা নাই। তিনিই একমাত্র চেতনস্বরূপ বলিয়া সকলের দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা হইতে পারেন, অপর কেহ হইতে পারে না। হে গার্গি, এই অক্ষরসংজ্ঞক ব্রহ্মেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে (অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মরূপ অক্ষরই চরম সত্যস্বরূপ বলিয়া আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত আপেক্ষিক সত্যবস্তু তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই নত্যবৎ দৃষ্ট হইতেছে।)

বাচস্পয়ী গার্গী জ্ঞাতব্যের চরমসীমাস্বরূপ যাজ্ঞবল্ক্যের এই ব্রহ্মনির্ণয় শুনিয়া নিশ্চিতচিত্তে সভাস্থ বেদবিদ ব্রাহ্মণসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আমার কথা শুনুন; যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজয় করিবার ছুরাশা পরিত্যাগ করুন। পরাজয় করা দূরে থাকুক, যদি আপনারা যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কার করিয়া তাঁহার নিকট পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তবে তাহাই আপনাদের যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে করিবেন। কারণ ‘ব্রহ্মোত্ত’ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাস্ত করিতে পারেন এরূপ কেহই

আপনাদের মধ্যে নাই। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমার প্রশ্ন দুইটির উত্তর দিতে পারিলে যাজ্ঞবল্ক্য সকলের অজেয় হইবেন।

গার্গী ইহা বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন। শাকল্য গার্গীর কথা না শুনিয়া সুদীর্ঘ জটিল প্রশ্নাবলী উত্থাপন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করিবার উদ্ভম করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য সেই সকল প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি শেষে শাকল্যকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এবং তাহার উত্তর দিতে না পারায় শাকল্যের যে দশা হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। গার্গীর কথাই সত্যে পরিণত হইল,—অর্থাৎ কেহই যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না।

ব্রহ্মবাদিনী গার্গী জীবন্মুক্তা ছিলেন। পূর্বোক্ত বর্ণনায় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে মাথা খসিয়া যাইবার ভয় দেখাইয়াছিলেন। এই কথাটা আক্ষরিক ভাবে বিচার করিলেও যিনি জীবন্মুক্ত, এইরূপ ভয়ে তাঁহার ভীত হইবার কারণ কি আছে? এইরূপ একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উঠিতে পারে। আক্ষরিক অর্থে যাজ্ঞবল্ক্যের কথায় গার্গীর মাথা খসিয়া পড়িবার খুবই সম্ভাবনা ছিল—গার্গী তাঁহার প্রশ্নের উত্তরের জন্য ছুরাগ্রহ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার সেই দশা হইত। গার্গী প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় বিরত হইয়া সেই সম্ভাবনাকে সত্যে পরিণত হইতে দিলেন না। ইহাতে তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া আর প্রশ্ন করিলেন না—ইহা কোন রূপেই সূচিত হয় না। তিনি মৃত্যুভয়-ভীত না হইলেও

অনর্থক মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিবেন কেন ? কোন জীবন্মুক্ত পুরুষ
 কি মৃত্যুভয়শূন্য বলিয়া স্বেচ্ছায় গলায় পাথর বাঁধিয়া জলে
 ডুবিয়া মরিতে যান ? তিনি জীবিত থাকিলে যে সমাজের
 বহু কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তাহা তাঁহার যাজ্ঞবল্ক্যসহ
 দ্বিতীয়বার ব্রহ্মবিচারে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । কারণ এতদ্বারা
 তিনি দুর্গম ব্রহ্মবিজ্ঞানের পথ অনেকটা সুগম করিয়া গিয়াছেন ।
 এক্ষেত্রে এই বরণীয়া ব্রহ্মবিদ্বতী নারীর অবদান সুমহৎ,—
 সেইজন্য শ্রুতিপ্রসিদ্ধা গার্গী অমর হইয়া আছেন, এবং
 আর্যানারীরা তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিতা বোধ করেন ।

পঞ্চম অধ্যায়

লীলা

ব্রহ্মবিহ্বলী লীলার আখ্যানটি যোগবাশিষ্ঠের উৎপত্তি প্রকরণে (১৫শ হইতে ৫৯ম সর্গ পর্য্যন্ত) বর্ণিত হইয়াছে। বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দিতে দিতে দৃশ্যমান জগৎটা বাস্তবপক্ষে কি পদার্থ—তাহা বিচারপূর্ব্বক দেখাইতেছিলেন। শুদ্ধাৰ্হিত দৃষ্টিতে জগৎ-তত্ত্ব কিরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই এ স্থলে বশিষ্ঠদেব ব্যাখ্যা করিতেছেন। ‘জগৎ’ বলিয়া যে বস্তুটাকে চক্ষুর সম্মুখে দেখা যায়—ইহা জগৎ নয়, প্রকৃত পক্ষে ইহা চিদাকাশ (= আত্মা, ব্রহ্ম)। মেঘের সংস্থানবিশেষকে আকাশে মুক্তাশ্রেণী বলিয়া ভ্রম হয়—সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃ আত্মায় জগদ্ভ্রম হইতেছে। আত্মদর্শন হইলে জগদ্দর্শন থাকে না। অতএব এই স্থূল পিণ্ডাকার জগৎ অনুভূত হইলেও স্বপ্নদৃশ্যের ত্রায় অলীক,—শয্যায় শুইয়া স্বপ্নে হস্তী দৃষ্ট হইলেও যেমন হস্তী সেখানে একেবারেই নাই—সেইরূপ। জগৎ চিন্ময় ব্যোম। শূত্ৰ, জগৎ, ব্যোম, ব্রহ্ম, আমি বা আত্মা—ইহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। এই তত্ত্বটি সহজে বুঝাইবার জন্য বশিষ্ঠদেব ‘মণ্ডুপোপাখ্যান’ নামে একটি আখ্যানের অবতারণা করিলেন। লীলার চরিত্র ইহাতেই বর্ণিত হইয়াছে।

লীলা পদ্য নামক একজন বিবেকবুদ্ধিযুক্ত, শ্রীমান্ ও বহু

পুত্রবান্ নরপতির সৌভাগ্যশালিনী প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন। লীলা পতিপরায়ণা সাধ্বী—ছায়ার আয় সদাই স্বামীর অনুগতা। মৃত্যু আসিয়া কোন সময়ে স্বামীর সহিত তাঁহার বিয়োগ ঘটাইবে,—লীলা এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন—নিজের তপোবলে স্বামীকে অজর অমর করিবেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মানুষ কিরূপে অমরত্ব লাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, দেবি। তপোবলে অশ্রু সবই সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু অমরত্ব হয় না। লীলা ইহা শুনিয়া ভাবিলেন—যদি শূভাদৃষ্টবশতঃ পতির আগেই আমার মৃত্যু হয় তবে কোন দুঃখ নাই, কিন্তু পতি যদি সহস্র বৎসর পরেও আমার সম্মুখে পরলোকগমন করেন, তাঁহার বিয়োগজনিত দুঃখ আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। তবে মৃত্যু হইলেও পতির জীব যদি এই গৃহ ছাড়িয়া না যান—এই অন্তঃপুর-রূপ মণ্ডপ মধ্যেই থাকেন, তাহা হইলেও আমি সুখী হইব। আমি আজই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তপশ্চরণ দ্বারা ভগবতী সরস্বতী দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব। পতির অজ্ঞাতসারে তিনি এই ব্রত অবলম্বনপূর্বক ঘোর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনশত নিশা অতিবাহিত হইলে ভগবতী লীলার সাধনায় তুষ্ট হইয়া তদীয় সম্মুখভাগে আবির্ভূতা হইলেন এবং অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

লীলা বলিলেন—হে ত্রিজগজ্জননি! আপনার জয় হউক। হে মাতঃ! আপনার এই দুঃখিনী কন্যা দুইটি বর প্রার্থনা

করিতেছে। আমার স্বামী দেহত্যাগ করিলেও তাঁহার জীবন যেন আমার এই অন্তঃপুর-রূপ মণ্ডপ হইতে বাহিরে না যায়, এবং আমি যেন ইচ্ছা করিলেই ^{অনুসারে} দর্শন পাই।

দেবী পার্শ্বতী 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। কালক্রমে নরপতি পদ্মের মৃত্যু হইল। লীলা পতিবিয়োগে অতিশয় কাতরা হইলেন। তাঁহাকে শোকবিহ্বলা দেখিয়া কৃপাময়ী দেবী সরস্বতীর আকাশবাণী হইল—বৎসে! পতির মৃতদেহ পুষ্পদামে আবৃত করিয়া রাখ। দেখিতে পাইবে—একটি পুষ্পও ম্লান হইবে না এবং মৃতদেহও বিনষ্ট হইবে না। তাহার জীবাত্মাও তোমার অন্তঃপুর-মণ্ডপ ছাড়িয়া অন্য় কোথাও যাইবে না। লীলা দৈববাণী অনুসারে তাহাই করিলেন। অর্দ্ধরাত্রে লীলা সরস্বতীর ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবী লীলার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—‘বৎসে, তুমি কেন আমাকে স্মরণ করিয়াছ? তুমি কিসের জন্ত বা শোকাক্ত হইয়াছ? এই সংসারটি ভ্রমবিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে,—ইহা মৃগতৃষ্ণিকার স্বায় মিথ্যা।

লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আমার পতি এক্ষণে কোথায়, কিভাবে রহিয়াছেন জানিতে চাই। আমি তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না। তাঁহার নিকট আমাকে লইয়া চলুন।’

দেবী বলিলেন—‘চিত্তাকাশ, চিদাকাশ, ও মহাকাশ—এই তিন প্রকার আকাশ। প্রত্যক্ষ আকাশকে মহাকাশ বলে। চিত্তাকাশ বাসনাময়। এই দুই আকাশ যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়,

তাহা চিদাকাশ (= চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম), যাহাতে সমস্ত পদার্থ অবস্থান করিতেছে, জন্ম-স্থিতি-লয় যাহাতে হইতেছে। সেই চিদাকাশে তোমার পতি আছেন, ধ্যান দ্বারা চিদাকাশের সাক্ষাৎকার হয়। ধ্যানবলে মুহূর্ত্তমধ্যে চিত্ত মহাকাশ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, এবং যতদূর যায় ততদূর চিদাকাশ দ্বারা ঐ চিত্তবৃত্তি প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশকেই বলে সন্ধি বা জ্ঞান। চিদাকাশ এই জ্ঞানস্বরূপ। কল্লিত দ্বৈত জগতের আত্যন্তিক বিস্মৃতি না হইলে চিদাকাশে স্থিতি লাভ হয় না। ইহা কঠিন, পরিশ্রমসাধ্য বটে, কিন্তু আমার কুপায় তুমি সহজে উহা লাভ করিবে।

এই কথা বলিয়া দেবী অন্তহিতা হইলেন। দেবীর প্রসাদে লীলা অনায়াসে সমাধিস্থা হইলেন। পঙ্কিনী যেমন নীড় পরিত্যাগ করিয়া আকাশে উড়ডীন হয়, সেইরূপ তিনি স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্বিবকল্প সমাধিযোগে চিদাকাশস্থ হইলেন। তথায় তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন— তাঁহার পতি তাঁহাদেরই রাজধানীর পুরীমধ্যে রাজগণ ও সচিব-বৃন্দ পরিবৃত্ত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। পুষ্প, কপূর ও ধূপের সদৃশ চারিদিক আমোদিত, যথানিদ্দিষ্ট স্থানে ঋষিগণ বেদ পাঠ করিতেছেন, এবং রথ-হস্তী-অশ্বগণ যথাস্থানে অবস্থিত আছে। পরিচারকগণ রাজার আদেশ পালনে কৰ্ম্মতৎপর হইয়া আছে। বহু যুদ্ধজিত নৃপতি চত্বরে বন্দিদশায় রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই লীলা দেখিলেন—সেই মহতী রাজসভায় নানা-

দেশীয় দূতগণ উপস্থিত হইল। দাক্ষিণাত্য, কর্ণাট, মাল্লব, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে দূতগণ কোথাও যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা, কোথাও সৈন্যসংঘর্ষ, কোথাও আক্রমণের বিবরণ রাজার নিকট বিজ্ঞাপিত করিল। তারপর দক্ষিণ মহাসমুদ্রের তট হইতে একজন দূত আসিয়া লঙ্কাপুরী আক্রমণের সংবাদ দিল। পূর্ব সমুদ্রতট হইতে জনৈক তপস্বী আসিয়া রাজাকে বলিলেন— মহেন্দ্রপর্বতে মহান্ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। উত্তর মহাসমুদ্র এবং পশ্চিম মহাসমুদ্রতট হইতে এক দূত আসিয়া বলিল যে, ঐ ঐ অঞ্চলেও বিদ্রোহ বা বিগ্রহ ঘটিয়াছে। লীলা সেই সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। কারণ, তিনি তখন আকাশশরীরীণী। লীলা দেখিলেন— সেই রাজা, সেই রাজ্য, সেই ভৃত্য-আমত্য, সেই দেশ, সেই আচার-ব্যবহার—সবই সেই। লীলা ভাবিলেন—রাজার স্থায় নগরবাসী সকলেই মরিয়াছে না কি? তখন দেবী সরস্বতী লীলার সমাধি ভঙ্গ করিয়া দিলেন। লীলা দেখিলেন—রাজসভা ইত্যাদি কিছুই নাই, তিনি পূর্ববৎ নিজ গৃহেই রহিয়াছেন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর—সকলেই নিদ্রিত। সখীদিগকে জাগাইয়া তাঁহাকে রাজসিংহাসন পার্শ্বে লইয়া যাইতে বলিলেন এবং তখন রাজসভার অধিবেশনের জ্ঞাত্য আদেশ করিলেন। রাজ্যের আদেশানুযায়ী রাজসভা বসিল; মন্ত্রী, অমাত্য ও সামন্তগণ আপন আপন নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিলেন। সভাস্থল জনপরিপূর্ণ ও শোভাযুক্ত হইল। লীলা আসিয়া পতির সিংহাসনের

পার্শ্বস্থিত সুবর্ণ-সিংহাসনে বসিলেন। তৎপর সমস্ত দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া স্থির করিলেন যে, একমাত্র রাজাই নাই—রাজা ব্যতীত সকলেই জীবিত আছেন। লীলা ইহা দেখিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পতির দেহপার্শ্বে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এ কি অদ্ভুত মায়া! রাজপুরীর সকল নরনারী, সকল দ্রব্য ও ব্যাপার আমার অন্তরে ও বাহিরে উভয়ত্রই সমান দেখিলাম। একটি পর্বত যেমন বাহিরে ও দর্পণ মধ্যে তুল্যরূপ দৃষ্ট হয়, আমিও সেইরূপ এই দৃশ্য জগৎ অন্তরে ও বাহিরে তুল্যরূপে দেখিলাম। বুঝিতেছি না—এই দুইয়ের কোন্টি সত্য, কোন্টি মিথ্যা। দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিব। লীলা দেবীকে স্মরণ করিলেন। দেবী আসিলেন। লীলা নিজ সংশয়ের বিষয় বলিলেন।

দেবী।—তোমার দৃষ্টিতে কোন্ বস্তু সত্য, কোন্ বস্তু মিথ্যা—তাহা আমাকে বল।

লীলা।—অশ্বিকে! আমি ও আপনি যে এখানে বসিয়া আছি—আমার মনে হয় এই সৃষ্টিই অকৃত্রিম, এবং আমার পতি যেখানে আছেন, তাহা কৃত্রিম; কারণ, শূন্যে দেশকালাদির অবস্থান স্বপ্নদৃশ্যের মত অলীক।

দেবী।—কার্য্য কারণের সদৃশই হয়। অকৃত্রিম হইতে কৃত্রিমের উৎপত্তি হয় না।

লীলা।—কারণ হইতে বিসদৃশ কার্য্যের উৎপত্তি দেখা

যায়,—যেমন ঘট ও মৃৎপিণ্ড একরূপ নহে। ঘট দ্বারা জল আনা যায়, মৃৎপিণ্ডের দ্বারা তাহা হয় না।

দেবী।—সহকারি-কারণ সংযোগে উৎপন্ন কার্য কারণের ভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন দৃষ্ট হয়। তোমার পতির উৎপত্তিতে সেরূপ কোন কারণ ভেদ নাই,—মূলানুসন্ধান করিলে সহকারী কারণভেদ লক্ষিত হইবে না। এখানে যে পৃথ্বাদি ভূত ও ভৌতিক বস্তু, সেখানেও তাহা। যদি বল উহারা এই ভূমণ্ডলে জন্মিয়া সেই ভূমণ্ডলে যায় তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—এখানকার যুক্তিকাদি সেখানে যায় কি না? তাহা ত' যায় না, যাওয়া অসম্ভব। তবে সেখানে এতদনুরূপ সৃষ্টি হয় কিসে? অথচ উভয়ত্রই একরূপ দৃষ্ট হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, তোমার পতির উৎপত্তি বিষয়ে ভিন্নতাকারক পৃথক্ সহকারী কারণ নাই। ইহা হইতে অনুমান দ্বারা স্থির করিতে হইবে যে, যাহাতে উৎপত্তি হয়, পূর্ব্ব সর্গীয় কাম-কর্ষ-বাসনাদিই তাহার কারণ। সেইজন্য স্থায়ী বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না।

লীলা।—আমি বুঝিলাম যে, আমার স্বামীর উৎপত্তির কারণ স্মৃতি, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান-সংস্কার।

দেবী।—ঠিক। স্মৃতি আকাশরূপ। সেইজন্য স্মৃতি হইতে তোমার পতির সৃষ্টিও আকাশরূপ।

লীলা।—বোধ হয় আমার স্বামীর ন্যায় এই দৃশ্যমান জগৎও স্মৃতি হইতে উৎপন্ন ও আকাশসদৃশ শূন্যরূপ।

দেবী।—তোমার অনুভব সত্য। পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুভবজনিত

সংস্কার হইতেই বর্তমান সৃষ্টি । চিদাকাশের, কোন এক মায়াযুক্ত অংশে সৃষ্টিকর্তার অন্তঃকরণে আকাশরূপ কাচখণ্ডের দ্বারা আবৃত সংসাররূপ একটি মণ্ডপ অবস্থিত আছে । স্বর্গ, মর্ত, নদী, পর্বত, চতুর্দশ ভুবন ইত্যাদি এই মণ্ডপের অবয়ব । যেমন একপ্রকার কীট নিজের রচিত কোশে নিজেই আবদ্ধ হয়, এই মণ্ডপের জীবগণও সেইরূপ নিজ নিজ ভাবনারূপ পাশে আবদ্ধ হইয়া আছে । এই সংসার-মণ্ডপের গিরি-বন প্রদেশে বশিষ্ঠ নামক একজন ধর্মকর্মনিষ্ঠ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । প্রসিদ্ধ (ব্রহ্মার পুত্র) বশিষ্ঠের ন্যায় তাঁহার স্ত্রীর নামও অরুন্ধতী ছিল । একদিন কোন রাজার আড়ম্বরপূর্ণ রাজকীয় শোভাযাত্রা দেখিয়া ব্রাহ্মণের মনে রাজা হইবার প্রবল ইচ্ছা হইল । তাঁহার ধর্মকর্ম সবই এই সঙ্কল্প সাধনায় নিয়োজিত হইল । কালক্রমে ব্রাহ্মণের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তাঁহার পতিপরায়ণা স্ত্রী অরুন্ধতী তোমারই মত আমার আরাধনা করিয়া তুমি যে বর লাভ করিয়াছ, ঠিক সেই বর লাভ করিয়াছিলেন । মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণের পূর্ববাসনায়ুক্ত অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবাকাশ অরুন্ধতীর গৃহাকাশেই রহিয়া গেল । পূর্বসঙ্কল্পপ্রভাবে বশিষ্ঠ সেই গৃহাকাশেই ত্রিলোকজয়ী রাজা হইলেন । অরুন্ধতীও প্রায় পতির সঙ্গে সঙ্গেই ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া আকাশরূপী পতিসহ মিলিত হইয়া হৃষ্ট হইলেন । আজ আটদিন সেই দম্পতী দেহ ত্যাগ করিয়াছেন । তাঁহাদের গৃহ, ধনসম্পত্তি সেই স্থলেই পড়িয়া আছে, এবং তাঁহারা এ

গৃহমণ্ডপেই রাজা-রাণী হইয়াছেন। হে লীলে! তোমার পতি ও তুমিই ইতঃপূর্বে সেই ব্রাহ্মণ ও অরুন্ধতী ছিলে, যাঁহারা আজ আটদিন হইল রাজত্ব লাভ করিয়াছেন। সৃষ্টি যে কিরূপ ভ্রমময়, তাহা এখন বুঝ। পূর্বভ্রম (সংস্কাররূপ) হইতে বর্তমান ভ্রম, বর্তমান ভ্রম হইতে ভবিষ্য ভ্রম—এইরূপ সংস্কার ধারা চলিয়াছে। সকল ভ্রমই চিদাকাশে প্রতিবিস্তৃত হয়। সুতরাং আত্মদৃষ্টিতে এই সকল সংস্কার-সৃষ্টি মিথ্যা হইলেও আশ্রয় দৃষ্টিতে (চেতন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া এই সকল ঘটতেছে বলিয়া) সত্য। ভ্রান্তি দূর হইলে সৃষ্টিও থাকে না।

লীলা।—আপনার কথা সত্য কি মিথ্যা—বুঝিতেছি না। আপনি বলিলেন—আমরাই সেই বিপ্র-দম্পতী। কিন্তু এখন কোথায় উঁহারা, কোথায় আমরা! তাঁহারা সেই ক্ষুদ্র গৃহাকাশে, আমরা এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতলে। সুতরাং সেখানকার বিপ্র-দম্পতী যে আমরা, এবং সেই আমরাই যে রাজত্ব করিতেছি—ইহা কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সমাধি অবস্থায় আমি পতি-পালিত যে বিস্তীর্ণ রাজ্য দেখিয়াছি, তাহাও এই ক্ষুদ্র গৃহমধ্যেই স্থিত—ইহাও অসম্ভব কথা।

দেবী।—আমার কথার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। ‘মিথ্যা বলিও না’—ইহা আমাদেরই স্থাপিত নিয়ম। যে ইহা ভঙ্গ করে, আমরা তাহার শাসন করি। সুতরাং আমরা ঐ নিয়মের অগ্রথা করিতে পারি না। স্বপ্নাবস্থায় যেমন জাগ্রৎ স্মৃতির লোপ হয়, সেইরূপ মৃত্যুর পর জীবের পূর্ব সংসারের অনুভূতি

থাকে না। " সেই গৃহাকাশে অবস্থিত ব্রাহ্মণের আকাশরূপী জীবাশ্মায় আর পূর্ব সংসার স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার রাজ্য বাসনায়ুক্ত অন্তঃকরণ দ্বারা উপহিত চিদাশ্মায় আকাশাকার রাজ্য দর্শন হইতেছে। স্বপ্নে বা মনঃকল্পনায় একটা বৃহৎ রাজ্য দেখার আশ্রয় এইরূপ দর্শন হয়। ইহাতে স্থানের সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন অসঙ্গতি কল্পনা করাও উচিত নহে। ক্ষুদ্র দর্পণে যেমন বৃহৎ বস্তু দর্শন হয় এবং উহা যেমন মিথ্যা, ঐরূপ দর্শনও সেইরূপ। রহস্য এই যে, পরমাত্মাতেই সমস্ত অসত্য সৃষ্টি সত্যবৎ প্রতিভাত হয়—অর্থাৎ জগতের সত্যতা জগতের নহে, কিন্তু চিদাশ্মার সত্যতায় জগৎ সত্য বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ যেমন মিথ্যা, জাগ্রৎ দৃষ্ট জগৎও তদ্রূপ। যদি পরমাণুতুল্য সূক্ষ্ম মনের ভিতর ত্রিজগৎ দর্শন হইতে পারে, তবে গৃহাকাশ মধ্যে উহার অবস্থান অসম্ভব কেন হইবে?

লীলা।—জননি, আজ আটদিন মাত্র হইল সেই ব্রাহ্মণ দেহত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বহুকাল হইতে এখানে আছি। তবে আমরাই সেই ব্রাহ্মণ-দম্পতী—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়?

দেবী।—বৎসে, স্থানের আশ্রয় কালেরও হ্রস্ব-দীর্ঘ নাই। বলিয়াছি জগৎ একটা জ্ঞানের প্রতিভাস মাত্র। ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিব্যরাত্রি, মাস, বৎসর, যুগ, কল্প—এ সকলও জ্ঞানের প্রতিভাস মাত্র। ভ্রান্তি দ্বারাই এই সকল ভেদ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ দেশ

ও কালের, ও তাহাদের হৃদয় দীর্ঘত্ৰাণ্ডি জন্ম মিথ্যা অনুভূতি—
 যেমন স্বপ্নে অতীতকালের মধ্যেও শতবর্ষব্যাপী ঘটনা ঘটয়া
 যায়,—যেমন হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর বলিয়া
 বোধ হইয়াছিল। পূর্বোক্ত চিত্তাকাশের স্বভাবহেতু আপনার
 মধ্যেই ঐ সকল আন্তর্জ্ঞান জন্মে। স্বপ্নে যেমন ঐরূপ হয়,
 পরলোক-দশাতেও সেইরূপ হয়। জাগ্রৎ-দশা, স্বপ্ন-দশা,
 পরলোক-দশা—এই তিন দশায় কোন ভেদ নাই। অর্থাৎ
 তিনিই আন্তর্জ্ঞান। তিন অবস্থাই অ-জাত, জন্মরহিত,
 মৃত্যুরহিত। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জগৎপ্রাণ্ডি দূর হয়,—
 যেমন রজ্জুজ্ঞানে সর্পপ্রাণ্ডি দূর হয়। রজ্জুতে সর্পের আয় জগৎ
 প্রাণ্ডির বিবর্ত। জাগতিক দৃশ্যজাতের আন্তর্জ্ঞানিক বিশ্বাসই
 মোক্ষ।

লীলা।—দেবি, আপনি বলিলেন—পূর্ব সংস্কারই জগৎ
 দর্শনের কারণ। আমি ত' কখনও আপনার কথিত ব্রাহ্মণ-
 ব্রাহ্মণী-রূপ সৃষ্টি দেখি নাই, তবে আমার ঐরূপ দর্শন কিরূপে
 হইল ?

দেবী।—বাসনা সৃষ্টির কারণ, সত্য; কিন্তু কেবল
 পূর্বানুভব জন্ম সংস্কারই সৃষ্টির কারণ নহে। শুদ্ধচেতন বা
 আত্মায় আশ্রিত মূল্য মায়াও সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ। এই
 মায়া রূপী বাসনা বিশেষ কোন জীবের পূর্ব অনুভবজনিত সংস্কার
 জন্ম নহে। এই মায়াবিশিষ্ট মহাচেতনাই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের
 কারণ। ইহাতে জীবের পূর্বানুভব জন্ম সংস্কারও সহকারী।

সংস্কারও মায়ায় থাকে, কিন্তু সংস্কার-নিরপেক্ষ মূলা মায়ায় প্রভাবেও অনুভূত বস্তুর দর্শন হয়। মায়া অপসারিত হইলে কার্য্য, কারণ, সহকারী—সবই চৈতন্যসত্তায় এক হইয়া যায়। অতএব জগৎ-দৃশ্য বস্তুতঃ সত্তাহীন।

লীলা।—দেবি, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য, কৌতুকজনক ব্যাপার। সেই ব্রাহ্মণ যেখানে স্থায়ী পত্নীসহ আছেন, আমাকে সেই স্থানে লইয়া চলুন। আমি নিজে দেখিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিব।

দেবী।—চিদাকাশস্থিত সেই ব্যোমাত্মস্বরূপ সৃষ্টি তোমার এই ভৌতিক দেহ সমাধিযোগে বিস্মৃত না হইলে, অর্থাৎ দেহ-জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত, দেখিতে পারিবে না।

লীলা।—এই দেহে অত্র জগৎ দেখিতে না পারার কারণ কি?

দেবী।—এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহার বাস্তবিক কোন আকার নাই—মায়া ইহাকে মূর্ত্ত বলিয়া বোধ করায়, যেমন অজ্ঞানদৃষ্টি কূলহীন সমুদ্রের কূল দেখায়। শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভব ইহার প্রমাণ; কিন্তু দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মদর্শন হয় না। তুমি এখনও সেই অবস্থা লাভ কর নাই, তুমি এখনও আপনাকে বদ্ধ জীব বলিয়া অভিমান কর। বৎসে! আমার এই দেহ সঙ্কলনগরের আয় ও শুদ্ধসত্ত্বময়। সেইজন্ম আমার দেহে সদাই ব্রহ্মদর্শন হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাব বশতঃ তোমার দেহ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। সেইজন্ম

তুমি এই দেহে চিদাকাশস্থ সৃষ্টি দেখিতে সমর্থ নহ। তুমি যখন নিজ দেহমধ্যস্থ সংকল্পিত নগর দেখিতে পার না, তখন কি প্রকারে অন্তের সংকল্পিত রাজ্যাদি দেখিতে পারিবে? যদিও তোমার এই দেহ মনোময়, তথাপি চিরকাল উহা ভৌতিক বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছ বলিয়া উহা ভৌতিকপ্রায় হইয়া গিয়াছে। দেহে আত্মাভিমান ত্যাগপূর্বক চিদাকাশরূপিণী হইতে চেষ্টা কর, তবেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। যখন তোমার আধিভৌতিক জ্ঞান তিরোহিত হইয়া আত্মাত্মিক জ্ঞান উদিত, স্থায়ী ও দৃঢ় হইবে, তখনই তুমি মুক্ত হইয় চিদাকাশস্থ সৃষ্টি দর্শন করিতে পারিবে। অতএব তুমি বাসনা বিনাশ করিয়া মুক্ত হইতে যত্ন কর। জ্ঞানরূপ চন্দ্রমা পূর্ণ ও স্থায়ী না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি যোগ দ্বারা দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া চিত্ত মাত্র অবলম্বনে তৎকালীন জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই পরলোক দর্শন করিতে পার। কিন্তু আমার দেহের সহিত মিলিত হইয়া তুমি সেই লোকে যাইবার আশা করিও না। কারণ, তোমার স্থূল জড়দেহ আমার শুদ্ধসত্ত্বময় দেহ সহ সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না।

লীলা।—দেবি, বাসনা ক্ষয় কিরূপে হয়, এবং হইলে কি ফল হয়—কৃপা করিয়া উপদেশ করুন।

দেবী।—নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তন, পরস্পর ব্রহ্ম-চর্চা, পরস্পর ব্রহ্ম বুঝাইতে যত্ন এবং সদা একনিষ্ঠ হওয়া—এগুলিকে ‘ব্রহ্মাভ্যাস’ বলে। ইহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। বৈরাগ্যশীল

পুরুষ উত্তম অভ্যাসী হইয়া থাকেন। উক্তরূপ ব্রহ্মাভ্যাস দ্বারা বাসনা জয় হয় এবং উহাই নিব্বাণ ফলদায়ক।

এইরূপ কথোপবথনের পর, সেই রাত্রিতে যখন সকলেই প্রসুপ্ত, তখন লীলা ও দেবী উভয়ে নিব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন-পূর্বক নিশ্চল নিম্পন্দ হইয়া রহিলেন। দেবী স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপিণী। সুতরাং তাঁহার নিজের জ্ঞান নহে, কিন্তু লীলাকে শিক্ষা দিবার জ্ঞান তিনিও সমাধিস্থ হইলেন। তখন তাঁহাদের নিকট অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বাহ্যজগৎ ভ্রান্তিসম্ভূত ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইল। তৎপর তাঁহারা দিব্যদেহে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে সত্যই স্থানান্তরে গমন করিলেন তাহা নহে। সেই প্রাদেশ পরিমিত গৃহাকাশে থাকিয়াই তাঁহারা সর্বগামী হইলেন—অর্থাৎ চিদ্বৃত্তির দ্বারাই আকাশে দূর হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিলেন। পরলোক দর্শন নিমিত্ত যে সংকল্প করিয়া তাঁহারা সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সংকল্প-সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইল। চিদাকাশদেহেও চিত্তস্থ পূর্ব সংকল্পিত দৃষ্টানুসন্ধান অনুবৃত্ত থাকে। ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা আকাশ মধ্যে পরস্পর অসংশ্লিষ্ট কোটি কোটি জগৎ ও অধিবাসিবর্গ—দেব, অশুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও নিশাচর দর্শন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—কোথাও জ্যোতিষ্ক্রে ভ্রমণ করিতেছে, কোথাও বিম্বনসমূহ মেঘগর্জনের ন্যায় শব্দ করিয়া চলিয়াছে, কোথাও গীতবাত্ত, কোথাও যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি। তাঁহারা গগনচরদিগের বিবিধ সম্পদ ও বৈভব দর্শন

করিয়া, পুনরায় পৃথিবীর দিকে আসিতে লাগিলেন। আকাশ-পথে ভূমণ্ডলের সংস্থান ও অবয়ব, সপ্তদ্বীপ ইত্যাদি দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা সেই বশিষ্ঠনামা ব্রাহ্মণ-গৃহ দর্শনার্থ চলিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন—গৃহের সকলেই শোকাচ্ছন্ন হইয়া রোদন করিতেছেন। দেবী ও লীলার অঙ্গকান্তিতে গৃহপ্রাঙ্গণ আলোকিত হইল, শুষ্ক বনলতাও যেন পল্লবিত হইল। এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দেখিয়া মৃত বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যেষ্ঠশর্মা গৃহজনের সহিত অগ্রসর হইয়া বনদেবীদিগকে নমস্কার এবং তাঁহাদের চরণে প্রণিপাত ও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া বলিলেন—হে বনদেবীদয়! আপনারা বোধ হয় আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্যই এখানে উপস্থিত হইলেন। দেবীদয় গৃহজনকে কিসের জন্য তাঁহারা দুঃখার্ভ হইয়া আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যেষ্ঠশর্মা বলিলেন,—আমার সর্বজনপ্রিয়, ধর্ম-পরায়ণ, অতিথি-বৎসল পিতামাতা সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেইজন্য আমরা শোকে মুহমান হইয়াছি। আশা করি, আপনারদের দ্বারা আমাদের দুঃখ দূর হইবে।

লীলা ইহা শুনিয়া তাঁহার করপল্লব জ্যেষ্ঠশর্মার মস্তকের উপর স্থাপন করিলেন। তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠশর্মার অন্তর হইতে শোক-মোহ দূরীভূত হইল এবং অত্যাশ্চর্য্য সকলেও দেবীদ্বয়ের দর্শনে সর্বদুঃখ বিস্মৃত হইল।

এখানে রামচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন যে, লীলা কেন মাতৃ-শরীরে পুত্র জ্যেষ্ঠশর্মাকে দর্শন দান করেন নাই? বশিষ্ঠদেব ইহার উত্তরে:

বলিলেন যে, ভৌতিক দেহের সৃষ্টি ও ধারণ—সমস্তই ভ্রান্তি জন্ম। একমাত্র চিদাত্মাই সত্য। শরীরকে যাহারা সত্য বলিয়া জানে, সেই ভাবনা প্রভাবে তাহাদের চিদাত্মাই জড় ভৌতিক দেহ ধারণ করে। যাহাদের ভ্রান্তি জ্ঞান দূর হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ পরিণাম আর হয় না,—যেমন মিথ্যা পিশাচজ্ঞান দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বালকেরা ভীত হয়, কিন্তু পিশাচজ্ঞান একবার দূর হইলে আর ভীত হয় না। পরমা-কাশকে পৃথ্বী ইত্যাদি রূপে জানিলে উহা পৃথ্বাদিই হইয়া যায়, না জানিলে অর্থাৎ সং-চিৎ বস্তুকে স্পন্দ চিদ্রূপে জানিলে আর কিছু হয় না। লীলার বস্তু-জ্ঞান হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়া-ছিলেন যে, পৃথ্বাদি কিছুই নাই। একমাত্র চিদাকাশই ভ্রান্তি দ্বারা নানা আকারে আকারিত হয়। এক ও অদ্বয় ব্রহ্মাত্ম সাক্ষাৎকারী ব্যক্তির আবার পুত্র, বন্ধু, কুটুম্বাদি কি থাকিবে? লীলা যে স্বীয় কর দ্বারা জ্যেষ্ঠশর্ম্মার শিরঃ স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহা পুত্রস্নেহ জন্ম নহে, কিন্তু জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পূর্ব স্মৃতিবলে তখন তাহার জ্ঞান লাভের সময় উপস্থিত হওয়ায় উহা সর্বানুস্মৃতা চিতিশক্তিরই বিবর্তনরূপ।

তৎপর দেবী ও লীলা তদ্রূপ সকলের অদৃশ্য হইলেন। শোক দূর হওয়ায় ব্রাহ্মণের পরিবারবর্গ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপ্ত হইল। লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার মৃত পতির জীব যেখানে রাজত্ব করিতেছেন, আমি সেখানে যখন যাই, তখন আমাকে কেহ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু এখানে পুত্রেরা দেখিতে

পারিল কেন ? দেবী বলিলেন—যখন তুমি সেখানে গিয়াছিলে, তখন তুমি সংকল্পসিদ্ধ হও নাই। দ্বৈতজ্ঞান দূর না হইলে ঐ সিদ্ধি হয় না। তখন তুমি ভাবিতেছিলে—তুমি রাজমহিষী লীলা। সত্যসংকল্প না হওয়ায় তখন তুমি কাহারও দৃষ্টিগোচর হইতে পার নাই। সম্প্রতি তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে তুমি সত্যসংকল্প হইয়াছ ; সেইজন্য পুত্রেরা তোমাকে দর্শন করুক—তোমার এই সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছিল।

লীলা।—আমার পতি বশিষ্ঠ এই মন্দিরাকাশেই থাকিতেন, এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়, এইখানেই তিনি রাজা হন, তাঁহার ভূতলস্থ রাজধানী এইখানেই ছিল, এইখানেই আমি তাঁহার রাণী হই। আবার আমার সেই রাজা-পতি পদ্ম মৃত্যুর পর এইখানেই (রাজা বিদূরথ নামে) রাজত্ব করিতেছেন। আমি দেখিতেছি নৈ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এই মণ্ডপাকাশেই স্থিত রহিয়াছে। * এক্ষণে আমার পতির সাম্প্রতিক রাজ্যব্যাপার যাহাতে দেখিতে পারি, তাহা করুন।

* বেদান্তমতে এক পরিপূর্ণ পরমাত্মাই আছেন, আর কিছু নাই। আত্মা সজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত সর্বপ্রকার ভেদ রহিত এক রস অনিচ্ছিন্ন সত্তা। সেইজন্য দেশ-কাল-বস্তু দ্বারা সেই সত্তায় কোন ব্যবধান উৎপন্ন হইতে পারে না, বস্তুতঃ দেশ কালাদি কোন বস্তুই সেখানে নাই। সেই সত্তায় ইহা এক স্থান, উহা অন্য স্থান, এবং এই স্থানের বা এই সময়ের ব্যাপার অন্য স্থানে বা সময়ে নাই—এইরূপ মনে করা অযৌক্তিক। অখণ্ডস্বরূপ সর্বত্র সর্বকালে সমভাবে বিद्यমান এই সত্তাই উপস্থিত আখ্যানে মণ্ডপাকাশ রূপে বর্ণিত।

দেবী।—হে প্রাক্তম অরুন্ধতি, তোমার পতি অনেক, সকলের দর্শন অসম্ভব। তবে তোমার তিন স্বামী—বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, (ব্রাহ্মণের পরজন্মে) পদ্ম নামক রাজা (লীলা বাঁহার রাণী), (পদ্ম মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিয়া এক্ষণ) বিদূরথ নামে অন্য মণ্ডলের রাজা—ইহাদের মধ্যে যে স্বামীর মণ্ডল দেখিতে ইচ্ছা কর, দেখাইতে পারি। বিদূরথ এক্ষণে রাজ্য শাসন-পালন নিমিত্ত ঘোর মোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছেন। ইহাদের সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডল। পরমাশ্রুতিতে সকলেরই আধার

সেই মণ্ডপাকাশই অখণ্ডাকার চিদাকাশ, বাহাতে জীবের বাসনানুযায়ী দেশকালান্বিত সমস্ত ব্যাপার নিরন্তর প্রতিবিম্বিত হইতেছে। কিন্তু চিদাকাশ স্বয়ং পরিচ্ছেদ রহিত একরস বলিয়া উহাতে দেশকাল জনিত ঐ সকল ব্যাপার—রাজা-রাজ্য, ভূমি-আমি, জন্ম-মরণ, সুখ-দুঃখ, পুণ্য-পাপ, স্বর্গ-নরক, এই সকল ভেদ নাই। সেখানে পৃথক্ পৃথক্ কাল নাই, অথবা সমস্ত দেশই এক দেশ, সমস্ত কালই এক কাল। সেখানে এক অখণ্ড চিদাকাশে জীব নিজ নিজ বাসনানুযায়ী কল্পিত পৃথক্ পৃথক্ দেশকাল বিভাগ করিয়া, নিজ নিজ মণ্ডল রচনা করিয়া কর্মফল ভোগ করে। তাই সেই একই চিদাকাশে একই স্থানে বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর মৃত্যুর পর আটদিনের মধ্যে পদ্ম-লীলার প্রায় সারা জীবনের ব্যাপার ঘটিল, এবং তদপেক্ষা অল্প সময়ে পদ্মের মৃত্যুর পর মাত্র একদিন মধ্যেই তাঁহারাই বিদূরথ ও দ্বিতীয় লীলা রূপে এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য শাসন-পালনে ও ঘোর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ একদিনকেই বিদূরথ সত্তর বৎসর মনে করিতেছিলেন! ইহা দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে যে, কাল একটা কল্পনা মাত্র, দেশও তদ্রূপ। বস্তুতঃ এক মুহূর্ত্ত মধ্যে চিদাকাশে অধ্যস্ত হইয়া স্বপ্নের স্রাব জীবের নানা জন্ম

চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে উহারা ভিন্ন ভিন্ন।

লীলা।—দেবি, তাহাই ঠিক। এক্ষণে আমি চক্ষুর সম্মুখে আমার অসংখ্য জন্ম বিবরণ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দেখিতেছি—হিরণ্যগর্ভ হইতে উৎপন্ন হওয়ার পর আমার অষ্টশত জন্ম অতীত হইয়াছে,—কখনও বিদ্যাধরা, কখনও বা মানুষী, নাগরাজ-পত্নী, চণ্ডালিনী, আশ্রমলতা, মুনিকণ্ঠা, রাজা, নকুলী, অপ্সরা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—দেবীদ্বয় যে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা স্থানান্তরে যান নাই। লীলার অন্তঃপুর গৃহমণ্ডপেই চিদাকাশে তাঁহাদের এই সকল দর্শন হইতেছিল। লীলা এক্ষণে ত্রিকাল-দর্শিনী হইয়াছেন। গিরি গ্রামে তিনি তাঁহার পূর্বতন জন্ম-মরণ ও কার্য্য চেষ্টাদি দেখিতে পাইলেন! তিনি তদ্রত্য সেই

পরিগ্রহ ও বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটয়া যায়, বহু দেশদেশান্তরে অবস্থিতি হয়, এবং স্বপ্নদৃশ্যেরই তায় মনে হয় যেন উহা কত বহুকাল ও বহু দেশব্যাপী। অতএব জাগ্রৎ দশাও স্বপ্নবৎ বুঝিতে হইবে। চিত্তস্থিত বিবিধ বিচিত্র সংস্কাররাশিই নানা ঘটনাসম্মূল জগৎরূপে দৃশ্যমান হইতেছে। স্থান-কালাদি আপেক্ষিক জ্ঞান হইতে (sense of relativity) নানা বস্তুজ্ঞান জন্মে। (যেমন আলোক আঁধার, ছোট বড় ইত্যাদি)। নতুবা বস্তুজ্ঞান হয় না। আপেক্ষিক জ্ঞানের অভাব হইলেই একত্ববোধ, এক অখণ্ড নিরপেক্ষ (absolute) সত্ত্বাবোধ হয়।

ব্রাহ্মণের গৃহিণীরূপে দাসীর শ্রায় মাত্র আটদিন পূর্বে যেখানে যে কার্য করিতেন, যেরূপ পানভোজন ও গৃহের অন্যান্য লোকেরা যাহা যাহা করিত, সমস্তই তাঁহার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল। তিনি বলিলেন—‘আমি দেখিতেছি এই স্থানে আমার পতি বশিষ্ঠ দৃঢ় ভাবনা জন্ম মৃত্যুর পর আটদিনের মধ্যেই আসমুদ্র ধরার অধিপতি হইয়া বিরাজ করিতেছেন। আকাশে যেমন বায়ু অদৃশ্যভাবে থাকে, সেইরূপ এই গৃহাকাশে পতির জীব রহিয়াছেন, এবং এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানেই তিনি সুবিস্তীর্ণ মহারাজ্য অনুভব করিতেছেন। হে পরমেশ্বর, এ-সবই চিদাকাশ, তথাপি যেন মায়াকুহকে উহাই গৃহ, পর্বত ইত্যাদিতে পূর্ণ রহিয়াছে।’

তৎপর দেবীদ্বয় মহাকাশে উড্ডীন হইলেন এবং চন্দ্রলোক, সূর্যালোক, ধ্রুবলোক, সাধ্যলোক, সিদ্ধলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া বৈকুণ্ঠ, গোলোক, শিবলোক—ইত্যাদি লোক সকল উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপর তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডপের সীমান্তস্থিত উহার ক্রমিক আবরণকারী দশগুণ জল, জলের দশগুণ অগ্নি, অগ্নির দশগুণ বায়ু, বায়ুর দশগুণ ব্যোম দেখিলেন। সেই ব্যোম আবার অসীম আদি-অন্ত-মধ্যহীন অবিভাসংযুক্ত চিদাকাশে আবৃত হইয়া আছে। গবাক্ষচ্ছিন্নগত সূর্য্যরশ্মিতে লক্ষ লক্ষ ত্রসরেণুর শ্রায়, মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃদ্ধদের শ্রায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সেই চিদাকাশে ভাসমান রহিয়াছে। এই সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের সন্নিঃ অর্থাৎ সংস্কার-জ্ঞান অনুসারে

রচিত। যাহার যেমন ধ্যান, সাধন বা কৰ্ম, তদনুসারে তাহার নিকট তাহার ব্রহ্মাণ্ডটি প্রতিভাত হয়। সম্বিতের স্বভাব এই যে, সঙ্কল্প দ্বারা কাল্পনিক সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নির্বাহ করে। তদ্ব-দর্শীর নিকট ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড চিদাকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় চিদাকাশেই উহাদের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে। চিদাকাশের মায়া সম্বলিত প্রদেশেই এই সকল ব্যাপার ঘটিতেছে,—মায়াযুক্ত প্রদেশে নহে। কত ব্রহ্মাণ্ড এখনও অব্যক্ত বা প্রসুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে, কত ব্রহ্মাণ্ডের কেবল অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়াছে, এই মুহূর্তেই কত শত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল উপস্থিত হওয়াতে তত্রত্য চন্দ্র-সূর্য্যাদি বিগলিত হইয়া যাইতেছে, কতকগুলি কেবল তর্কণা অর্থাৎ অনুমান দ্বারা বোধগম্য হয়। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞানকর্মানুযায়ী কেহ এক ব্রহ্মাণ্ডের, কেহ অন্য ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা হয়। সেই-ই এক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সহিত অন্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বৈলক্ষণ্য আছে। এবং ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। সূতরাং সৃষ্টির ক্রম অনিয়ত। কোন ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ ব্রহ্মা, কোনটির বিষ্ণু, কোনটির রুদ্র, কোনটির দুর্গা, কোনটির বিনায়ক প্রভৃতি। যে অনন্ত চিদাকাশে এই ব্রহ্মাণ্ড সকল বিস্তৃত, তাহার পরিমাণ বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ আজীবন তন্মধ্যে ভ্রমণ করিয়াও নির্দেশ করিতে পারেন না। ব্রহ্মাণ্ড সকল পরস্পর স্বাভাবিক ভূতাকর্ষণ শক্তিতেই বিধৃত রহিয়াছে।

দেবী ও লীলা বিশ্ববৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে রাজা পদ্মের অন্তঃপুর ২-ওপে আসিয়া তাঁহার পুষ্পাচ্ছাদিত শব ও

তৎপার্শ্বোপবিষ্ট সমাধিস্থা লীলাকে দেখিলেন। তৎপর তাঁহারা রাজা বিদূরথের সংকল্পরচিত জগতে প্রবেশ করিলেন। পদ্বই মরণান্তে বিদূরথ হইয়াছিলেন, সুতরাং ইনি লীলার সেই পতি। সেখানে তাঁহারা দেখিলেন—সিন্ধুরাজ সৈন্যে বিদূরথের রাজ্য আক্রমণ করায় উভয়ের চরজ সৈন্যমধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, এবং লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইতেছে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিক্ হইতে কোশল, কাশী, মৎস্য, অঙ্গ, বঙ্গ, অবন্তী, সুরাট প্রভৃতি দেশের রাজগণ সম্রাট বিদূরথের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন। সিন্ধুরাজ ও বিদূরথ উভয়েই সমবল। কাহারও জয়-পরাজয় হয় নাই,—এমন সময় সূর্যাস্ত হওয়ায় এবং উভয় পক্ষীয় বীরগণ শ্রান্ত-ক্লান্ত হওয়ায় রাজদ্বয়ের সম্মতি-ক্রমে সেই সময়ের জন্ম যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হইল। গভীর রাত্রিতে ককলে যখন নিদ্রিত, তখন দেবী ও লীলা বিদূরথের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহ আলোকে এবং মন্দারগন্ধে আমোদিত হইল। সকলেই নিদ্রিত, কিন্তু দেবীদ্বয়ের প্রভাবে বিদূরথ জাগ্রত রহিলেন। দেবী সমীপস্থ রাজার মন্ত্রীকেও প্রবোধিত করিলেন। বিস্মিতচিত্ত রাজা শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। দেবী সরস্বতী বিদূরথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘রাজন, তুমি কাহার পুত্র, কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এই স্থানে কত কাল আছ? রাজার পক্ষ হইতে মন্ত্রী উত্তর করিলেন—

‘হে দেবীদয়, আগাদের এই প্রভু মহারাজ ইক্ষ্বাকু-কুল সম্ভূত রাজা কুন্দরথের বংশে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জাত রাজা নভোরথের পুত্র। ইনি সুমিত্রা মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।’

দেবী সরস্বতী কর দ্বারা, কুতাজলিপুটে অবস্থিত রাজা বিদুরথের মস্তক স্পর্শ পূর্বক বলিলেন—‘রাজন, তোমার প্রাক্তন জন্ম-পরম্পরা স্মরণ কর।’ দেবীর স্পর্শে রাজার অজ্ঞানতমঃ দূরীভূত হইল। তিনি পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়া বলিলেন যে, তিনি ইতঃপূর্বে সম্রাট ছিলেন, লীলা নামে তাঁহার মহিষী ছিল—ইত্যাদি। তৎপর রাজা বলিলেন—‘কি আশ্চর্য্য! আমি স্পষ্ট দেখিতেছি আমার একদিন মাত্র মৃত্যু হইয়াছে, অথচ ইহার মধ্যে আমার সত্তর বৎসর অতীত হইয়া গেল।’

দেবী বলিলেন—‘রাজন, তুমিই বশিষ্ঠ নামীয় ব্রাহ্মণ ছিলে। তোমার মরণ-মুহূর্ত্তেই সেই স্থানেই তুমি সঙ্কল্পজাত লোক সকল অনুভব করিয়াছ। গিরিগ্রামের ব্রাহ্মণ-গৃহ, পদ্ম ভূপতির রাজ্য—ইত্যাদি সমস্তই তোমার চিত্তাকাশে অঙ্কিত ছিল। যাহা যাহা অনুভব করিয়াছ, সমস্তই সেই ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডপে অর্থাৎ তোমার অন্তরস্থ কল্পনায় স্থিত, অতঃ কোন স্থানে নহে। জ্ঞান-দৃষ্টিতে এ-সকল স্বপ্নবৎ মিথ্যা। তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হউক, আমরা এক্ষণে যাই।’

রাজা বলিলেন—‘আপনার দর্শন কখনও বিফল হয় না। আমি কত দিনে আবার প্রাক্তন দেহ প্রাপ্ত হইব—আমাকে

উপদেশ করুন। অপর প্রার্থনা এই যে, আমি যেখানেই যাই, আমার এই মন্ত্রী ও এই কুমারী যেন সেখানে যাইতে পারে।

দেবী বলিলেন—‘মহারাজ, উপস্থিত সংগ্রামে তোমার মৃত্যু হইবে। মৃত্যুর পর সকলের প্রত্যক্ষে তোমার পূর্ব রাজ্য ও শবীভূত দেহ প্রাপ্ত হইবে। তোমার মন্ত্রিগণ ও এই কুমারীও পূর্বতন স্থান প্রাপ্ত হইবে।

এই সময়েই একজন দূত আসিয়া শত্রু সৈন্যের পুনরাক্রমণের সংবাদ দিল। তাহাদের অস্ত্রবর্ষণে চারিদিকে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল—ঘর-বাড়ী, গৃহ-জ্ঞন, শস্যাদি দগ্ধ হইতেছিল। রাজা ও উপস্থিত সকলে বাতায়নের ছিদ্র দিয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। এ-দিকে অন্তঃপুর মধ্যেও শত্রুগণ প্রবেশ করিয়া ঘোরতর উপদ্রব করিতেছে দেখিয়া রাজমহিষী সখী ও দাসীগণ সহ রাজসমীপে আগমন করিলেন। এই রাজমহিষীর নামও লীলা, দেখিতে অবিবর্তিত সরস্বতী-সহচরী লীলার ন্যায়। সখীগণের মধ্য হইতে এক নারী অন্তঃপুরের বিপদের সংবাদ দিলেন। শুনিয়া রাজা বিদূরথ মহিষীকে রক্ষার্থ দেবী ও লীলার হস্তে সমর্পণ করিয়া এবং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবার জন্ত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বহির্গমন করিলেন। মহিষী-লীলা দেবী-লীলার নিকট আসিলেন। দেবী-লীলা বিস্মিত হইয়া সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

‘দেবি, কি দেখিতেছি! ইনি যে আমার একেবারে আত্মসদৃশী। বুঝিতেছি না—ইনিই আমি বা আমিই ইনি।

এই মন্ত্রী ও রাজপুরীর সিপাহীদিগকেও যেন আমার রাজ্যের জনগণ বলিয়াই মনে হইতেছে। তাহা হইলেই বা ইহারা এখানে কিরূপে আসিল ? জননি, ইহারা কি দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ আমার চিত্তে ও বাহিরে রহিয়াছে ? প্রতিবিম্ব মাত্র হইলেই বা ইহারা চেতনযুক্ত কিরূপে হইতে পারে ? এ কি দৃশ্য দেখিতেছি, আমাকে বলুন।’

সরস্বতী বলিলেন।—‘লীলে, সংস্কার চিত্তে নিহিত থাকে। কারণ সহযোগে যখন উহা উদ্ভূত হয়, তখন ঠিক তদ্রূপ অনুভূতি উৎপাদন করে। চিং-শক্তির প্রভাব অচিন্তনীয়। যেমন চিত্র স্বপ্নকালে জাগ্রৎ-অনুভূত অবস্থার আকারে আকারিত হয়, সেইরূপ চিংশক্তি চিত্তের সহিত তাদাত্ম্যসময়ে চিত্তের আকারে আকারিত হয়। চিদাভাসযুক্ত চিত্তে যে আকারের সংস্কার থাকে, উদ্ভূত হইলে সেই সংস্কার সেই আকারেই সমুদিত হইবে। ইহাতে দেশ, কাল প্রতিবন্ধক হয় না। এই নিয়মানুসারে যে-জগৎ প্রকৃত পক্ষে জীবের অন্তরে, আত্মচেতন্যে অধ্যস্ত ও স্থিত, সেই জগৎই বাহিরে না থাকিলেও আছে বলিয়া মনে হয়, ঠিক যেমন স্বপ্নে চিত্ত হইতেই নানা বস্তু দৃষ্ট হয়। তোমার গৃহে যে ভাবে, যে বাসনা লইয়া তোমার পতি মৃত হইয়াছিলেন, তৎকালেই, সেই স্থানে তাঁহার অন্তঃকরণে সেই সেই ভাব ক্ষুরিত ও বহির্ব্যক্ত হইয়াছিল। মৃত্যুকাল হইতেই তিনি বাসনারূপ সৃষ্টি অনুভব করিয়া আসিতেছেন। বর্তমান মন্ত্রী প্রভৃতি পূর্বের মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত

আকারে সন্দেহ হইলেও বিভিন্ন। বৎসে, তোমার পূর্ব বাসনা অর্থাৎ সংস্কার কোন অংশে কম বেশী হইয়া উদ্ভুদ্ধ হওয়ায় পূর্বতন মন্ত্রী ও পৌরবর্গের ব্যবহার ও চেষ্টাদি দেখিতেছ বলিয়া অনুভব করিতেছ। যেমন রাজার স্বাত্মাকাশে প্রতিভা অর্থাৎ জ্ঞান বা অনুভব সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে, সেইরূপ তোমার আত্মাকাশেও হইতেছে। সেইজন্য তুমি বিদূরথ-পত্নী দ্বিতীয়া লীলাকে অবিকল আত্মসদৃশ দেখিতেছ। জীব স্বকীয় প্রতিভায় নিজের সংস্কার অনুযায়ী প্রতিবিশ্ব দর্শন করে। প্রতিভাই আত্মার রূপ। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই প্রতিভাময় অর্থাৎ চিন্মাত্রস্বভাব—ইহা তত্ত্বজ্ঞ জনেরা জানেন, অতএব নিত্য অবয়ব-বজ্জিত ব্রহ্মেরই ভাবান্তর, নামান্তর মাত্র,—উহার নিজের কোন আকার নাই। সেইজন্য উহা একেবারে অর্থশূন্য নহে। আন্তি-দৃষ্ট বলিয়া উহা সত্য নহে, সত্য ব্রহ্মেরই ভাবান্তর বলিয়া অসত্যও নহে। সত্য হইলে বাধ হইত না, অসত্য হইলে দৃষ্ট হইত না,—অতএব ইহা অনির্বাচ্য। অনির্বাচ্য মায়া-পিহিত সত্যস্বরূপ চৈতন্যই জীবরূপে অবভাসিত হয়, অতএব জীবত্বও অনির্বাচ্য।

তৎপর সরস্বতী দ্বিতীয়া লীলাকেও বলিলেন যে, তাঁহার পতি রাজা বিদূরথ যুদ্ধে এই দেহ ত্যাগ করিয়া মৃত পদ্য রাজ্যের শবীভূত দেহে অনুপ্রবেশ করিবেন।

দ্বিতীয়া লীলা।—আমি প্রতিদিন সরস্বতী দেবীর অর্চনা করিয়াছিলাম, তৎফলে তিনি আমাকে রাত্ৰিকালে স্বপ্নে দেখা

দিয়াছিলেন। দেবীর আকৃতি যেমন দেখিয়াছিলাম, আপনাকেও ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বর দান করুন।

দেবী।—আমি তোমার ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।

দ্বিতীয়া লীলা।—আমার পতি দেহত্যাগ করিয়া যেখানে যে শরীরে থাকিবেন, আমি যেন এই শরীরে তাঁহার পার্শ্বে থাকিতে পারি।

দেবী।—তাহাই হইবে। তুমি বহুকাল আমাকে পুষ্প-ধূপাদি বিবিধ উপচারে পূজা করিয়াছ, সেইজন্য আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন। দেবীর এই কথা শুনিয়া প্রথমা-লীলা কিছু বিস্ময় ও সন্দেহের মধ্যে পড়িলেন। একটু ভাবিয়া তিনি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘দেবি, আপনি আমাকে স্থলদেহ ত্যাগ করাইয়া সেই গিরিগ্রামে ও এখানে আনিলেন, কিন্তু এই লীলাকে স্ব-শরীরেই পতিলোকে গমনের আদেশ করিলেন।’ ইহার কারণ জানিতে আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।

দেবী।—বৎসে, আমি কাহার কিছু করি না। জীবেরা নিজ সংকল্পানুযায়ী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহারা শুভকর্মানুসারে যে ফল পাইবে, আমি বর প্রদান দ্বারা উহা প্রকট করি মাত্র। চিদাম্বরূপিণী জীবশক্তিই তাহাদিগকে কর্মানুরূপ ফলদান করে। আমি সেই জীব শক্তির প্রকাশকারিণী অধিষ্ঠাত্রী। আমার

আরাধনাকালে তোমার জীবশক্তি 'আমি দেহাভিমান শূন্য হইব' এইরূপে উদ্ভুদ্ধ হইয়াছিল। সেইজন্য তোমাকে আমি অজ্ঞানশূন্য নির্মল পরিস্থিতিতে আনিয়াছি। আবার এই দ্বিতীয়া লীলার জীবশক্তি আমার আরাধনাকালে পূর্বেই তাহার অভীষ্টরূপে উদ্ভুদ্ধ হইয়াছিল। আমি উহাই প্রকট করিবার জন্য তদনুযায়ী তাঁহাকে স্থূল শরীরে পতিলোকে যাইবার বর দিয়াছি। তপস্যা বা দেবতা কেহ কিছু নহে। নিজের চেষ্টা দ্বারা প্রবুদ্ধ চিৎশক্তিই সেই সেই তপস্যা ও দেবতা হইয়া অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকে। অতএব যে যাহা চায়, পূর্ব হইতে তজ্জন্য প্রযত্ন করিলে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে।

বিদূরথ অস্ত্রশাস্ত্রে সজ্জিত ও পরিকরবর্গ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে রথারোহণ পূর্বক গৃহ হইতে রণাঙ্গনের দিকে ছুটিলেন। সিদ্ধুরাজ ও বিদূরথ এক্ষণে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই সমাযুদ্ধ ও সমান সমরনিপুণ যোদ্ধা। সেইজন্য তাঁহাদের মধ্যে সমান ভাবেই ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে সিদ্ধুরাজ হস্তে বিদূরথ পরাজিত ও সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া পতিত হইলেন।

সংগ্রাম যখন চলিতেছিল, তখন বিদূরথের আসন্ন পরাজয়ের সম্ভাবনা অনুভব করিয়া উভয় লীলা সরস্বতী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘দেবি, আমাদের পতি কেন জয়লাভ করিতে পারিতেছেন না, বলুন।’ দেবী বলিলেন—‘পুত্রীযুগল, সিদ্ধুরাজ জয়লাভ কামনায় বহুকাল আমার আরাধনা করিয়াছিল।

বিদূরথের আরাধনায় ঐরূপ কামনা ছিল না। সেইজন্য সিন্ধুরাজের জয় ও বিদূরথের পরাজয় হইতেছে। আমি সন্নিহিতরূপ, আমাকে যে ব্যক্তি যে কার্যে নিয়োগ করে, আমি সেই কার্যের ফলরূপিণী হইয়া তাহার সেই কার্য সেইরূপে সম্পন্ন করিতে বাধ্য। বিদূরথ মুক্তিকামী, সেইজন্য আমি তাহার প্রতিভায় মুক্তিদাত্রী হইয়াছি। বিদূরথ দেহত্যাগ করিয়া তোমাদের উভয়ের সহিত মুক্তিপদ লাভ করিবে— ইহা তোমরা জানিতে পারিবে। সিন্ধুরাজ আরাধনার ফল-স্বরূপ এই রাজ্যের রাজা হইবে।’

তাহাই হইল। বিদূরথ হত হইলে সিন্ধুরাজ ঐ দেশের রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। মুমূর্ষু বিদূরথকে নিজ গৃহে আনা হইলে প্রবুদ্ধ (প্রথমা) লীলা উহা দেখিয়া দেবীকে বলিলেন—‘মাতঃ, আমার পতি দেহত্যাগ করিতেছেন।’ দেবী বলিলেন—‘পুত্রি, এই যে একটা মহারাষ্ট্রবিপ্লব যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখিলে, ইহাতে রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি নাই, পৃথিবীরও কিছু হয় নাই। কারণ, বাস্তবপক্ষে জগৎটা স্বপ্নাত্মক, উহার জন্ম-স্থিতিই নাই বলিয়া ক্ষতি কি হইবে? বিদূরথের এই রাজ্য পদ্ম রাজার অন্তঃপুরের গৃহাকাশে এবং পদ্মের রাজ্য সেই বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের গৃহাকাশে রহিয়াছে। আবার সেই ব্রাহ্মণের শব্দগৃহে এই সারা জগৎ,—সুতরাং বিদূরথের রাজ্যরূপ ব্রহ্মাণ্ডটিও অবস্থিত আছে। অতএব তুমি, আমি, এই (দ্বিতীয়া) লীলা, বিদূরথ, এই সমাগরা পৃথিবী—এমন কি ত্রিজগৎই সেই ব্রাহ্মণের

গৃহাকাশের মধ্যে আছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেই আকাশেও কিছুই নাই—উহা একেবারে শূন্য। ভূতাকাশেই যখন এই জগৎ নাই, তখন চিদাকাশে উহার থাকিবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র চিৎস্বরূপ অবিনাশী জাগতিক আত্মাই বিবিধ আকারে প্রকাশিত হন, কখন বা অপ্রকাশিত থাকেন। দৃশ্য হইতেছে দ্রষ্টার দর্শনের বিষয়। সুতরাং দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পারে না,—কর্তা কর্ম হইতে পারে না। সেইজন্য দ্রষ্টা ও দৃশ্যের আপাততঃ যে ক্রম দেখা যায় উহা মিথ্যা বলিয়া অদ্বৈতবাদের ভ্রমণ। দৃশ্যরূপ ভ্রান্তি না থাকিলে দ্রষ্টা-দৃশ্য কিছুই থাকে না,—থাকেন কেবল অদ্বয় পরমাত্মদেব। দ্রষ্টা-দৃশ্যের মিথ্যা ক্রমানুসারে সেই মণ্ডপগৃহে জনগণ নিজ নিজ ভাবে ব্যবহার করিতেছে, অথচ তাহাতে কিছুই নাই। স্বপ্নে প্রাদেশ পরিমাণ হৃদয়দেশে যেমন লক্ষ লক্ষ পর্বতাদি দেখা যায়, পরমাণু ভূলা মনের মধ্যে যেমন লক্ষ লক্ষ জগৎ দেখা যায়, সেইরূপ প্রত্যেক চিদগুর অর্থাৎ জীবের মধ্যে এক একটি প্রকাণ্ড জগৎ রচিত হইয়া আছে। লীলে, সেই সব জগতের মধ্যে যে জগতে পদ্ম রাজার শবদেহ স্থিত আছে, তোমার সপত্নী লীলা তোমার অলক্ষিতে পূর্বেই সেখানে চলিয়া গিয়াছেন। তুমি ঐ লীলাকে মূচ্ছিত হইতে দেখিয়াছিলে। মূচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পদ্ম স্মীপে যাইয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন।

লীলা।—দেবি ! তিনি তথায় আমার সপত্নীভাবে কিরূপে আছেন ?

দেবী।—বলিতেছি, শুন। শুনিলে তোমার সম্যক্ জ্ঞান হইবে। বিদূরথরুণী তোমার স্বামী পদ্ব সেই শব্দশ্রয়ীভূত গৃহে রাজ্য ও নগরাদিরূপে দৃশ্যমান জগন্ময়ী ভ্রান্তি দর্শন করিতেছেন। বৎসে, এই যুদ্ধ ভ্রান্তি-যুদ্ধ, এই সকল লোক-জনও ভ্রান্তি। তুমি যে পদ্বের দয়িতা হইয়াছিলে, তাহাও ভ্রান্তি। তুমি ও দ্বিতীয়া লীলা উভয়েরই সত্তা স্বপ্নবৎ। তুমি যেমন পদ্ব রাজার স্বপ্ন, পদ্বও তোমাদের সেইরূপ স্বপ্ন। তোমার পতি তোমারই মনঃকল্লিত, এবং তোমার সপত্নী লীলাও তোমার সেই মনঃকল্লিত পতির মনঃকল্লিত। যেদিন তোমার পতির মৃত্যু হয়, সেই দিনই তাঁহার চিত্ত লীলা-মূর্তির বাসনায় অভিভূত হইয়াছিল, এবং সেই দিনই তিনি চিদাকাশে তোমার শ্রায় আকৃতিশালিনী, যেন তোমারই প্রতিবিম্বময়ী তাঁহার বাসনাময়ী দ্বিতীয়া লীলাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তোমার পতি সেই বাসনাময়ী মূর্তিকেই সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অতএব তুমি যে লীলাকে দেখিতেছ, সে লীলাও তুমি অর্থাৎ তোমারই ছায়া। একই চিদাত্মা সকলের ভিতর সমরূপে আছেন, সেইজন্য তুমিও তোমার ঐ বাসনাময় অণু দেহ দেখিয়াছ এবং বাসনাময়ী লীলাও তোমাকে দেখিয়াছেন। যখন যেখানে যেরূপ বাসনা উদ্ভূত হয়, সর্বানুসৃত ব্রহ্ম তখন সেখানে সেইরূপ দৃশ্য স্বপ্ন দেখার মত দেখেন। ঐ দ্বিতীয়া লীলা আমার আরাধনা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল—‘আমি যেন বিধবা না হই।’ আমিও উহাকে সেই বর দিয়াছিলাম।

সেইজন্তু তিনি পতির অগ্রে মরিয়াছেন, এবং এখনও তিনি বালিকা। তিনি তোমার চৈতন্তেরই অংশরূপিণী এবং আমি তোমাদের আরাধ্যা চৈতন্তময়ী কুলদেবী। আমি স্বভাবতঃই এইরূপ করিয়া থাকি। সেই লীলা দেহান্তে বাসনানুরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব স্মৃতিবশতঃ পদ্মের মণ্ডপে গমন করতঃ তৎসহ মিলিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়া লীলা পতিসহ মিলিত হওয়ার পূর্বেই তাহার সেই কুমারী কন্যাটি চলিয়া গিয়া আকাশ-পথে ছিলেন, এবং মাতাকে আকাশ-পথে দেখিয়া বলিলেন—‘মাতঃ আপনি নির্বিঘ্নে আসিয়াছেন ত? আমি আপনার প্রতীক্ষায় আকাশ-পথে রহিয়াছি।’ লীলা কুমারীকে সরস্বতী দেবী মনে করিয়া বলিলেন—‘দেবি, আমাকে শীঘ্র পতিসমীপে লইয়া যাউন।’ কুমারী কিছু না বলিয়া লীলাকে লইয়া বহু লোক-লোকান্তর অতিক্রম করিয়া পদ্ম রাজার শবপার্শ্বে আনয়ন করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। লীলা পদ্ম-দেহকে নিজ পতিরই শব মনে করিয়া চামর লইয়া শবদেহ বীজন করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া প্রবুদ্ধ লীলা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘পদ্ম-গৃহের লোকজনেরা তখন কি মনে করিতেছিল?’

দেবী বলিলেন, তাহারা কেহই সেই রাজা ও লীলাকে এবং আপনাদিগকে পরস্পর পরস্পরের অপরিচিত বলিয়া মনে করিল না। সর্বগত এক চিৎ পদার্থেই সকলে প্রতিবিম্বিত হইয়া সকলকে আপন আপন সম্বন্ধসহ দর্শন করিতেছিল।

কারণ, তাহারা পরমাত্মতত্ত্বে অজ্ঞান ছিল।

প্রবুদ্ধ লীলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবি! আপনার বর সত্ত্বেও লীলা স্থূলদেহে পতির নিকট যাইতে পারিল না কেন?

দেবী উত্তর করিলেন—যাহারা স্থূলদেহাভিমानी, সেই অজ্ঞানীরা কখনও স্থূলদেহে পবিত্র লোকে প্রবেশ করিতে পারে না। সৃষ্টির আদিতে সত্যসংকল্প সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্ত্বক এই অলঙ্ঘ্য নিয়ম কল্পিত হইয়াছে যে, সত্য ও অসত্য কখনও মিলিত হইবে না। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার সংকল্পানুযায়ী যাহা যেরূপে ও যে নিয়মে প্রকাশিত হইয়াছিল, এখনও তাহা সেই নিয়মানুসারে চলিতেছে। জীবন-নিয়তি ও মরণ-নিয়তি ঐ নিয়মানুসারেই নিদিষ্ট। জীব তদনুসারে নিদিষ্টকাল পর্য্যন্ত জীবন এবং তদন্তে মরণ অনুভব করে। তবে কৰ্ম্ম, দেশ, কাল, ক্রিয়া এবং দ্রব্যের শুদ্ধতা অশুদ্ধতা আয়ুর ন্যূনাতিরেকের কারণ হয়—ইহাও উক্ত নিয়মের মধ্যে একটি অবাস্তব নিয়ম। ‘আমি স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহবিশিষ্ট বলিয়া আমার আকাশ-গমন সম্ভব নহে’—এইরূপ যাহাদের নিশ্চয়বুদ্ধি, তাহাদের আকাশগতি কিরূপে হইবে? সেই লীলা এখনও তাদৃশ জ্ঞান-বিবেক, পুণ্যবিশেষ ও বর লাভ করে নাই যদ্বারা সে তোমার দেহের আয় দেহ ধারণ করিতে পারে।

লীলা।—দেবি, আপনি সংক্ষেপে কাহার মরণ কিরূপে হয়, বলুন।

দেবী।—মূৰ্খ, ধারণাভ্যাসী (যাহারা দেহস্থ ঘটক্রাদি স্থানে মন স্থির করিতে সমর্থ) এবং যুক্তিমান (যাহারা যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত)—এই তিন প্রকার মুমূৰ্শুর শেষোক্ত দুই প্রকার মনুষ্য দেহত্যাগকালে সুখানুভব করে, মোটেই দুঃখানুভব করে না। বিষয়াসক্ত মূৰ্খজনেরা মরণ সময়ে দুঃখ অনুভব করে—শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার মৰ্ম্মচ্ছেদী দুঃখে অভিভূত হয়। জীব গুরু ও শাস্ত্রোপদেশে প্রবুদ্ধ হইলে জন্ম-মরণরূপ ভয় হইতে মুক্তিলাভ করে। বস্তুতঃ জন্ম-মরণ, নানা লোকে গমনাগমন—সমস্তই মনঃকল্পিত। জীব স্বস্থানে থাকিয়াই বাসনানুসারে পরলোকে গমনাগমন অনুভব করে। দৃষ্টান্ত দেখ—তোমার সেই পতি-জীব শবদগৃহের আকাশে থাকিয়াও বাসনানুসারে পরলোকগমনাদি অনুভব করিতেছে। স্ব স্ব জ্ঞান-কর্ম্মের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি হয়। মরণানন্তর অবস্থা তোমাকে বলিতেছি—সামান্য পাপী, মধ্য পাপী, স্থূল পাপী, সামান্য ধার্ম্মিক, মধ্য ধার্ম্মিক, উত্তম ধার্ম্মিক—এই ছয় প্রকার প্রেত। পাপীদের মধ্যে কোন কোন মহাপাতকী এক বৎসর পর্য্যন্ত মরণমূৰ্ছায় জড় পাষাণের ন্যায় থাকে। তৎপর সে জাগরিত হইয়া বাসনানুযায়ী বহু নরক-দুঃখ ভোগ করে ও নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করতঃ দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব করিবার পর হয়ত কাল-কালান্তরে তাহার সংসার-ভ্রম দূর হয়। কোন কোন পাতকী মরণ-মূৰ্ছার পরক্ষণেই জড় বৃক্ষাদি ভাব অনুভব কবে, তৎপর নরকভোগান্তে পৃথিবীতে

পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। মধ্য পাপীরা মরণ-মূচ্ছার পর কিছুকাল জড়ভাবাপন্ন থাকিয়া চৈতন্য লাভ করে এবং তিৰ্য্যগাদি জন্ম প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করে। সামান্য পাপীরা মরিয়াই মনুষ্যদেহ অনুভব করিতে থাকে। মহাপুণ্যশীল লোকেরা মৃত্তি-মোহের পর স্বর্গশরীর লাভ করতঃ দিব্যভোগান্তে পুনরায় মনুষ্যলোকে জীমান্ গৃহে জন্মগ্রহণ করে। মধ্যম ধার্মিকেরা মরণান্তে নন্দনকাননাদিতে কিন্নর হইয়া ভোগান্তে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে। সামান্য ধার্মিকেরা মরণান্তে বাসনানুরূপ লোক ও ভোগ প্রাপ্ত হয়। জীব মরণ-মূচ্ছা ভঙ্গের পর মনে করে যে, সে মরিয়াছে। অগ্নিসংস্কারের পর পুত্রাদিরা পিণ্ডদান করিলে সে অনুভব করে যেন তাহার শরীর হইয়াছে, তৎপর যেন যমালয় গমন করিল। তৎপর সে মনে করে যে, যমরাজ কর্তৃক কৰ্ম-বিচারান্তে সে নরক বা স্বর্গভোগের উপযুক্ত জন্ম প্রাপ্ত হইল।

এই স্থলে রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠদেব বলিলেন যে, জীবের দেহান্তে পিণ্ডদান দ্বারা যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাও তাহার পূর্বসংস্কারজাত। সেই সংস্কারবশতঃ ‘আমি পিণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছি’ এইরূপ বুদ্ধি হয় এবং উহা হইতেই তাহার শরীর উৎপন্ন হয়। বন্ধুগণ পিণ্ডদান করিলেও হয়, না করিলেও হয়। (তবে পিণ্ডদানাদি দ্বারা মৃত ব্যক্তির চিত্তে উক্ত সংস্কার বা বাসনা উদ্ভিত হইবার সহায়ক অবস্থা সৃষ্ট হয়)। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা বলেন যে, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায়ই জীব চিত্তময়

—কখনও ইহার অন্তথা হয় না। অপ্রাপ্তপিণ্ড ব্যক্তিরাত্ত
 ‘আমি সপিণ্ড হইয়াছি’ এইরূপ জ্ঞান দ্বারা সপিণ্ড অর্থাৎ
 ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। আবার ‘আমি নিষ্পিণ্ড’ এইরূপ জ্ঞানে
 সপিণ্ড ব্যক্তিও নিষ্পিণ্ড হয়। ভাবনা দ্বারা বিষ অমৃতরূপে,
 অসত্য সত্যরূপে অনুভূত হয়। বন্ধুবর্গ যদি বহু ধর্ম-কর্মের
 অনুষ্ঠান করিয়া ধর্মবর্জিত কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে কর্মফল
 অর্পণ করে, তাহা হইলে সেই প্রেত ‘আমার কোন ধর্ম নাই’
 এইরূপ সংস্কারবান্ হইলেও ঐ অর্পিত কর্মফল দ্বারা উপকৃত
 হয়, এবং তাহার ‘আমি ধার্মিক’ ইত্যাকার সংস্কার বা বাসনা
 জন্মে। ইহার কারণ এই যে, শাস্ত্রোক্ত দেশ, কাল, ক্রিয়া
 ও দ্রব্যাদি সম্পন্ন অনুষ্ঠানাদি দ্বারা প্রেতের বন্ধুগণের যে বাসনা
 উদ্ভূত হয়, সেই বাসনা প্রেতবাসনা অপেক্ষা প্রবল। শাস্ত্রোক্ত
 ফলজনক কার্য্য ও লৌকিক কার্য্য মধ্যে প্রথমটি বলবত্তর।
 সেই জন্য বন্ধুবাসনার দ্বারা প্রেতের তদনুরূপ সংস্কার
 উৎপন্ন হয়। প্রেত যদি একেবারেই নাস্তিক ও শাস্ত্রদেষ্টা
 না হয়, তাহা হইলেই উক্ত ফল সম্ভব। কেন না, পিণ্ড-
 দানাদির শাস্ত্রোক্ত ফলাফল সম্বন্ধে যাহার বিশ্বাস আছে,
 তাহারই মরণান্তে তাদৃশ সংস্কার থাকিবে। প্রেতের প্রবল
 নাস্তিক্য সংস্কার থাকিলে বন্ধুবাসনাও দুর্বল হয়। যাবৎকাল
 মুক্ত না হয়, তাবৎকাল জীব এইরূপ নানা পরিবর্তন
 অনুভব করে।

তারপর দেবী বলিলেন, লীলে,—এক্ষণে ঐ দেখ, রাজা

বিদূরথ শরীর ত্যাগ করিয়া সেই শবীভূত পদ্মরাজার হৃৎপদ্মে যাইবার জন্ত চেষ্টা করিত হইয়াছেন।

লীলা।—দেবি, চলুন, আমরা দেখি তিনি কোন্ পথ দিয়া গমন করেন।

দেবী।—লীলে, ঐ দেখ, বিদূরথের চিন্ময় জীব বাসনাময় দেহ ও পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন ও ভাবিতেছেন, ‘আমি দূরবর্তী কোন লোকে যাইতেছি।’ চল, আমরাও ঐ কাল্পনিক পথের অনুসরণ করি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

দেবীর উপদেশ পরম্পরায় লীলার সমস্ত সংশয় দূর হইল। দেবী ও লীলা বিদূরথের পরলোকগমন অনুসরণ করিতে করিতে দেখিতে লাগিলেন যে, পক্ষী যেমন নিজ নীড়ে যাইবার জন্ত আকাশে উৎপত্তি হয়, বিদূরথের প্রাণবায়ুসংযুক্ত জীব সেইরূপ আকাশে উঠিল এবং দূরতর আকাশ পথে চলিল। তৎপর বায়ুবাহিত সেই জীবসম্বিৎ ক্ষণমধ্যে মরণমূর্ত্ত্যায় অসার হওয়ায় যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল যে, সে যমদূত দ্বারা নীত হইতেছে এবং বন্ধুদত্ত পিণ্ডাদি দ্বারা তাহার একটি দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। সে যমপুরী প্রাপ্ত হইল, যমরাজ কর্তৃক তাঁহার কৰ্ম্ম-বিচার হইল, সে নিষ্পাপ ও সরস্বতীর কৃপাপাত্র বলিয়া যমশাসন হইতে মুক্ত হইল। সে আকাশপথে গমন করিতে করিতে বহু ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হইল এবং পদ্মনগরে প্রবিষ্ট হইল। দেবী ও লীলা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের পূর্বেই সমাগত। দ্বিতীয়া লীলা পদ্মের শবপাশে ঠিক

পূর্বের আকারে, বেশে, বস্ত্রে, রূপে, গুণে, বয়সে, ভূষণে ও সৌন্দর্য্যে বসিয়া শবোপরি চামর ব্যজন করিতেছেন। কিন্তু ঐ লীলা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না।

এই স্থলে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—পূর্ব (পদ্ম রাজার রাণী) লীলা পদ্মগৃহে সমাধিযোগে যে স্থলদেহ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই দেহ কি হইল, কোথায় গেল, ছিল কি ছিল না, তাঁহার সেই নিজ দেহের সন্ধান না লইবার কারণ কি? উত্তরে বশিষ্ঠদেব বলিলেন—রাম, পূর্ব লীলার সেই দেহ আর কোথায় আছে! তাহা তো আর নাই। তাঁহার দেহভ্রান্তি দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভ্রান্তিদেহও তৎসম্বন্ধহীন হইয়া গিয়াছে। ভ্রান্তি দূর হওয়ার লীলা আর সেই দেহের অনুসন্ধান করেন নাই। (আমরা অতঃপর দেখিব যে লীলার দেহ পনের দিন পর্য্যন্ত বিকৃত হয় নাই, অর্থাৎ সেই সময় পর্য্যন্ত তাঁহার দেহাভিমান ছিল। দেবীর উপদেশে যখন লীলার দেহাভিমান একেবারে বিলুপ্ত হইল, তখন সেই দেহ গলিত হইতেছিল এবং ভস্মসাৎ করা হইয়াছিল। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে লীলার ভৌতিক দেহ থাকিলেও দেহস্মৃতি লুপ্ত হইয়াছিল)।

বিদূরথের জীব মৃত পদ্মদেহে প্রবেশ করিতে উদ্যত, এমন সময়ে সরস্বতী দেবী নিজ সংকল্প দ্বারা ঐ উত্তম নিরুদ্ধ করিলেন, অর্থাৎ শবদেহে প্রবেশ করিতে দিলেন না। এই সময়ে লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘দেবি! এই গৃহে পদ্মরাজা মৃত ও আমি সমাধিমগ্ন হইবার পর কতদিন অতিবাহিত হইল?’ দেবী

বলিলেন—‘লীলে। এক মাস অতীত হইয়াছে। তোমার দেহ কি হইল তাহাও বলিতেছি। পনের দিন পর তোমার দেহ বিকৃত হইতে আরম্ভ হইল দেখিয়া তোমার পরিজনবর্গ স্থির করিলেন যে, তুমি মরিয়াছ এবং এই বিশ্বাসে সেই দেহের অগ্নিসংকার করিলেন। সকলেই তোমার জ্ঞাত শোকাভিভূত হইলেন এবং যথাসময়ে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বৎসে, এখন যদি তোমাকে সশরীরে এখানকার কেহ দেখে, তবে নিশ্চয় পরলোক হইতে সমাগতা মনে করিয়া চমকিত হইবে। তুমি এক্ষণে আতিবাহিক দেহধারিণী, ব্রহ্মসম্পন্না সুতরাং সিদ্ধা হইয়াছ এবং তোমার প্রাক্তন আধিভৌতিক দেহ বিস্মৃত হইয়াছ, যেমন লোকে যৌবন প্রাপ্ত হইলে বাল্যাবস্থা বিস্মৃত হয়। আতিবাহিক জ্ঞান সুদৃঢ় হওয়ায় তোমার আধিভৌতিক জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানীর আধিভৌতিক দেহ অজ্ঞ জনগণের দৃশ্যমান হইলেও তাঁহার দৃষ্টিতে উহা জলশূণ্য মেঘের বা গন্ধশূণ্য পুষ্পের সহিত তুলনীয়। আজ একত্রিশ দিনের পর আমরা এই গৃহে আসিলাম! প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু এখনও আমার ইচ্ছায় ভূত্যগণ নির্জিত রহিয়াছে। লীলে! আইস আমরা এক্ষণে সত্যসঙ্কল্পতার খেলা খেলিয়া সেই অপ্রবুদ্ধ (দ্বিতীয়া) লীলাকে দেখা দেই ও মানুষের শ্রায় ব্যবহার করি।’ সঙ্কল্প মাত্র স্থলদেহ ধারণপূর্ব্বক দেবী ও প্রবুদ্ধ লীলা সুস্পষ্টরূপে অপ্রবুদ্ধ লীলার দর্শনগোচর হইলেন। গৃহ যেন সুবর্ণদীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিল। অপ্রবুদ্ধ লীলা

সেই জ্যোতির অত্যন্তরে পরিচিত দেবীদ্বয়কে দেখিয়া সসম্মমে গাত্রোত্থান পূর্বক তাঁহাদের পদে প্রণত হইয়া বলিলেন—‘হে দেবীদ্বয় ! আপনারাই আমার জীবনদাত্রী । আপনাদের জয় হউক । আপনাদের দাসী আমি পূর্বেই এখানে আসিয়াছি । আপনারা যে এক্ষণে এখানে আসিলেন, তাহা নিশ্চয় আমার মঙ্গলের জন্যই ।’

দেবীদ্বয় মহার্ঘ আসনে উপবিষ্টা হইলেন । সরস্বতী অপ্রবুদ্ধ লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি কিরূপে এখানে আসিয়াছ বল ।’ উক্ত লীলা উত্তর করিলেন—‘দেবি, প্রথমতঃ আমি বিদূরথ-গৃহে মূচ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম । সেই মরণমূচ্ছা ভাঙ্গিয়া গেলে জাগ্রত হইয়া দেখিলাম—আমি আকাশে অবস্থিত আছি । পরে বায়ুরূপ বাহন অবলম্বনে এখানে আসিলাম এবং দেখিলাম আমার স্বামী পুষ্পশয্যায় শয়ান আছেন । আমার মনে হইল—তিনি ঘোরতর রণশ্রমে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন । সেইজন্য আমি হীহার নিদ্রাভঙ্গ করি নাই । তারপর আপনারা এখানে আসিলেন ।’

সরস্বতী দেবী হাসিয়া উভয় লীলাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—‘লীলাদ্বয় ! আমি এই শায়িত রাজাকে উঠাইতেছি, দেখ ।’ এই কথা বলিয়া তিনি রাজার অবরুদ্ধ জীবকে ছাড়িয়া দিলেন । তৎক্ষণাৎ সেই জীব শায়িত রাজার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল এবং জীবসমাগমে নৃপতি পদ পূর্ববৎ কান্তিযুক্ত হইয়া জাগরিত হইলেন । তিনি নেত্র উন্মীলন করিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন—‘এখানে কে আছ?’ উভয় লীলা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—‘আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে।’

আকৃতিতে, প্রকৃতিতে, রূপে, গুণে, বাক্যে, স্বরে, কার্য্যে, ও ব্যবহারে সর্ব্বাংশে তুল্য দুই লীলাকে দেখিয়া পদ্ম-জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি কে, ইনিই বা কে? তোমরা কোথা হইতে আসিলে?’

এতদ্বারা দেবী দ্বিতীয়া লীলাকে সশরীরেই পতি লাভের যে বর দিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইল। লীলার পূর্ব্ব দেহ ভস্মসাৎ হইলেও কোন হানি হয় নাই। দেবীর কৃপায় লীলা সর্ব্বাংশে পূর্ব্ব দেহ তুল্য দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন—‘দেব, আমি আপনার সেই পূর্ব্ব-মহিষী লীলা। ইনিও আপনার স্ত্রী, ইহার নাম লীলা। আপনার জন্ম আমিই আমার প্রতিবিম্ব স্বরূপ এই লীলাকে গঠন করিয়াছিলাম, আর যিনি আপনার শিরোভাগে স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া আছেন, আমাদের বহু পুণ্যফলে প্রাপ্ত। ইনি সেই মঙ্গলময়ী সরস্বতী দেবী।’

রাজা উন্মিত হইয়া দেবীর চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন—‘হে সর্ব্বমঙ্গলময়ী ! হে দেবি ! হে সরস্বতী ! আপনাকে নমস্কার। হে বরদে ! আমাকে এই বর দান করুন যেন আমি পরমার্থ বুদ্ধিযুক্ত, দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্য্যবান্ হই।’ ভগবতী স্বীয় কর দ্বারা পদ্মের মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—‘পুত্র ! তুমি দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্য্যশালী হও, তোমার সমস্ত বিপদ ও পাপবুদ্ধি বিনষ্ট

হউক। তুমি অসীম সুখে কালযাপন কর, তোমার রাজলক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকুক এবং তোমার প্রজাগণ সুখী হউক।'

সরস্বতী দেবী বরদান পূর্বক অন্তর্হিতা হইলেন। পুরজনগণ জাগ্রত হইল। রাজা ও রাণীর সমাগমে পুর মধ্যে মহোৎসব চলিতে লাগিল। সাড়ম্বরে রাজার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দ্বিতীয়া লীলা ও মহারাজ পদ্ম ও ভগবতীর কুপায় লব্ধজ্ঞান ও জীবমুক্ত হইলেন, এবং তিন জনেই সুদীর্ঘকাল রাজত্ব ভোগের পর দেহান্তে বিদেহযুক্তি লাভ করিলেন।

যোগবাণিষ্ঠে লীলার আখ্যান হইতে আমরা এই কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারি—

১। সংকল্প হইতেই জগৎ। প্রত্যেক জীবই নিজ চিত্তগত সংকল্প, বাসনা বা সংস্কার অনুসারে নিজের ব্যাপ্তি সংসার সৃষ্টি করে। চিন্তের লয়ে জগতের লয়।

২। তবে জগৎস্রষ্টা কোন ঈশ্বর নাই? না, এতদ্বারা ঈশ্বর নাই বলা হইল না। যোগবাণিষ্ঠ শ্রোত মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন যে, জীব-সমষ্টিই, সমষ্টি জীবচেতনই ঈশ্বর। তিনি সমগ্র জগতের নিয়ন্তা, সূত্রাং প্রত্যেক জীবের ব্যাপ্তি জগৎ সৃষ্টির আদিতে তাঁহারই কল্পিত নিয়ম বা বিধি-ব্যবস্থানুসারে চালিত হয়—ইহার কিছুমাত্র অশ্রুতা হয় না।

৩। ভাগবতী শক্তিই গুরু। তিনিই সাধারণতঃ লৌকিক গুরু দ্বারা জীবের মোক্ষ বিধান করেন। পাত্র বিশেষে তিনি স্বয়ং গুরু হইয়া আসেন। যেমন ভগবতী সরস্বতী দেবী

লীলাকে তত্ত্বোপদেশ দিয়া মুক্ত করিয়াছিলেন। লীলার উপাখ্যানে অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়ী ভগবতীর অসীম কারুণ্য, ভক্তবাৎসল্য, জীব-উদ্ধারে ব্যগ্রতা, এবং তাঁহার আরাধনায় বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তি ও মোক্ষ লাভ সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। লীলা কঠোর তপশ্চরণ পূর্ব্বক সরস্বতীর নিকট বর চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার পতি রাজা পদ্ম মরিলেও যেন রাজপ্রাসাদস্থ অন্তঃপুররূপ মণ্ডপেই থাকেন। দেবী বলিলেন—‘তথাস্তু।’ তৎপর তিনি অপূর্ব্ব শিক্ষা কৌশলে লীলাকে আত্মজ্ঞান ও যোগদৃষ্টি প্রদান করিয়া দেখাইলেন যে পদ্ম সেই মণ্ডপেই অর্থাৎ মণ্ডপ-আকাশেই আছেন ও নানা ভোগ করিতেছেন।

৪। অবিচলিত পাতিব্রত্যধর্ম্মনিষ্ঠা। হইতেই লীলার সর্ব্বযোগসম্পত্তি, নিজের ও পতির মুক্তিসাভ হইয়াছিল। লীলা জীবনে-মরণে, জন্মে জন্মে, পতির অনুগামিনী। অসীম পতি-প্রেম মর্ত্তলোকেই লীলাকে অমৃতহ আনিয়া দিল, পতিকেও অমৃতের অধিকারী করাইল। এইটি নারীগণের বিশেষ শিক্ষণীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চূড়াল

(১)

তত্ত্বদর্শিনী চূড়ালার কথা যোগবাশিষ্ঠের নির্বাক প্রকরণে (পূর্বার্কে) বিবৃত হইয়াছে । বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে করিতে শিখিধ্বজ-চূড়ালার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিলেন, 'হে রাম ! তুমি তাহাদের ঞায় আশ্রাম হইয়া অবস্থান কর ।'

অতীত কল্পের কোন দ্বাপরযুগে শিখিধ্বজ-চূড়াল নামে এক রাজদম্পতী ছিলেন । শিখিধ্বজ কুরু-বংশীয় নৃপতি, তাঁহার রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী নগরে । শিখিধ্বজ বীর, উদার, সত্যবাদী, প্রিয়ভাষী, পণ্ডিত, সুন্দর, ধার্মিক ছিলেন । তিনি নানাবিধ পূর্তকার্য্য দ্বারা রাজ্যের মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন । বেদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়াও তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন । ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য্যবীর্য্যেও তিনি অজেয় ছিলেন । বাল্যকালেই তিনি পিতৃহীন হন । তথাপি ষোড়শ বৎসর ব্যাপী দিগ্বিজয়-কার্য্যে রত থাকিয়া সমস্ত রাজগণকে নিজ বশে আনয়ন করিয়া সম্রাট পদাভিষিক্ত হইলেন, এবং ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন । যৌবন অবস্থায় উপনীত হইয়া তিনি বিবাহেচ্ছু হইলেন এবং সুরাষ্ট্র দেশের রাজার পরমা সুন্দরী

কথা চূড়ালার পাণিগ্রহণ করিলেন। চূড়াল শিল্প-গীতাদি বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। রাজা শিখিধ্বজও অনুকূল ভাষ্যার সাহচর্য্যে সঙ্গীতবিদ্যায় পণ্ডিত হইলেন। কেবল সঙ্গীতবিদ্যায় নহে, কিন্তু তাঁহারা উভয়েই সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ইহার ফল তাঁহাদের পরবর্ত্তী জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছিল। ভোগ-বিলাসে বহুদিন অতিবাহিত করিবার পর তাঁহাদের উভয়ের চিন্তেই তত্ত্ববিচারের উদয় হইল। তাঁহারা বুঝিলেন—সংসারে এমন কোন বস্তু নাই যাহা লাভ করিয়া জীব পুনরায় দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। দীর্ঘকাল পরম্পর অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা তাঁহারা বুঝিলেন যে সংসার-ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত একমাত্র আত্মজ্ঞানই পরম ঔষধ। তাঁহারা আত্মনিষ্ঠ হইলেন ও পরম্পর পরম্পরের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, এবং তজ্জন্ম তাঁহাদের মধ্যে প্রীতিও বন্ধিত হইল। চূড়াল আত্মতত্ত্বজ্ঞদিগের নিকট যে সকল তত্ত্বকথা শ্রবণ করিতেন, তাহা তিনি দিবারাত্র নিরন্তর পালন করিতেন। ঐকান্তিক শ্রবণ-মনন ফলে তাঁহার তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইল। সাক্ষাৎ তত্ত্বদর্শনফলে তিনি পতি রাজা শিখিধ্বজকে ছাড়িয়া গেলেন। শিখিধ্বজের জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান, কিন্তু চূড়ালার অপরোক্ষ জ্ঞান হইল—যাহা উপনিষদে ‘যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম’ বলিয়া বর্ণিত।

চূড়াল এইরূপে স্বাভ্যাসে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন— অর্থাৎ তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠা উৎপন্ন হইল। ইহাই ‘জীবমুক্তি’

অবস্থা। চূড়ালার সেই অবস্থা কিরূপ—তাহা বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন,—‘রাগ, আসক্তি, দ্বন্দ্ব ও চেষ্টা তাঁহা হইতে অপগত হইল। তিনি ত্যাগ ও গ্রহণজ্ঞাত উদযুক্তা রহিলেন না। তিনি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূরগত হইয়াছে, তাঁহার অন্তরাত্মা পরমাত্মলাভে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার দীর্ঘকালের ভ্রান্তি অপগত হইয়াছে। তিনি এক্ষণে বিশ্রান্ত। যত উপমা থাকুক, তিনি সে সমুদায়ের অতীত হইয়াছেন। বরবণিনী চূড়াল। অতি স্বল্পকালেই বিদিত-বেদ্যা হইলেন। তাঁহার জগদ্ব্ভ্রম যে স্থান হইতে আসিয়াছিল, সেই স্থানেই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ণিত প্রকার বিশ্রান্তিপদে স্থিতি করায় চূড়ালার শোভা-সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইল, আত্মবিবেক অভ্যস্ত হইল, অব্যাকুল। স্থিতি উপস্থিত হইল এবং তিনি পুষ্পিত লতিকার অনুরূপ শোভায় সুশোভিত হইলেন।’ (কালীবরের অনুবাদ)

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মী স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে কেবল চূড়ালার চিত্তমধ্যেই যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হইল তাহা নহে, কিন্তু শরীরের মধ্যেও একটি অপূর্ব সৌন্দর্য্য বিকশিত হইল। শরীরের ভিতর দিয়া তাঁহার ‘ব্রহ্ম-বর্চস্’ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন তাঁহার স্বকৃ, অস্থি, রস, রক্ত, মজ্জা, পঞ্চভূত স্নায়ুগুণ ব্রহ্মতেজের কমনীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা শিখিধ্বজ চূড়ালার দেহে এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্তন দেখিয়া একেবারে বিস্ময়ে

অভিভূত হইলেন। তিনি চূড়ালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলে ? তোমার শোভা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী দেখিতেছি। প্রিয়ে ! অমৃতপানকারী, অলভ্যলাভকারী যেমন আনন্দে পূর্ণ হয়, আজ তোমাকে সেইরূপ আনন্দপূর্ণ দেখিতেছি। তোমার মূর্ত্তি শান্তিময়ী, অথচ কমনীয়া দেখিতেছি। হে মহাভাগে ! তুমি প্রশান্ত, গম্ভীর—তোমাকে এক্ষণ ক্ষীরসমুদ্রের সহিতও তুলনা করা যায় না। বোধ হয়, এক্ষণ তুমি কিছু পাইয়াছ, যাহার নিকট ত্রিলোকের আধিপত্যও তুচ্ছ।' চূড়াল নিম্নোক্ত অনুপম বাণীতে পতির জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন—

‘অজ্ঞজানোচিত দেহাশ্রাব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাশ্রাব লাভ করিয়াছি, তাই আমি শ্রীমতী। আত্মা ভিন্ন সমস্ত বস্তুই তুচ্ছ ও পরিচ্ছিন্ন। আমি অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছি, তাই আমি শ্রীমতী। এই সৃষ্টি কিছু ও কিছু নয়, অর্থাৎ যতক্ষণ দৃষ্টি ততক্ষণ সৃষ্টি, দৃষ্টির বিলয়ে সৃষ্টি থাকে না—এই তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি, তাই আমি শ্রীমতী। হর্ষ, ক্রোধ, ভোগ, অভোগ—ইহাতে আমার সমজ্ঞান, তাই আমি শ্রীমতী। অন্তর্বাহ একস্বরূপ—এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে আমি রমণ করি, রাজলীলায় রমণ করি না, তাই আমি শ্রীমতী। উদ্ভানে বা গৃহে যেখানেই থাকি, আত্মনিষ্ঠ অবস্থায় থাকি, তাই আমি শ্রীমতী। সমস্তই আমি, অথচ আমি এ সমস্ত কিছুই নহি,—যাহাকে লোকে ‘আমি’ বলে, সেই অহংরূপ আমি নহি—

আমি সত্যস্বরূপ, তাই আমি শ্রীমতী। লোকে সুখ চাহে, অ-সুখ চাহে না, কিন্তু আমি সুখ বা অ-সুখ বা কিছুই চাহি না, আমি খদচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, তাই আমি শ্রীমতী। যে প্রজ্ঞা বলে আমার রাগ-দ্বेष বিনষ্ট হইয়াছে, সেই প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রদৃষ্টি—এই সখীদ্বয়ের সঙ্গে আমি ক্রীড়া করি, তাই আমি শ্রীমতী। হে নাথ! ইন্দ্রিয়সমূহ বা মনের গোচর যাহা কিছু, সমস্তই মিথ্যা। আমি ঐ সকল প্রপঞ্চের অতীত নিষ্প্রপঞ্চ বস্তুকে সদাই দর্শন করি বলিয়া আমি অতীব শ্রীমতী হইয়াছি জানিবেন।’

রাজা শিখিধ্বজ চূড়ালার এই সকল অশ্রুতপূর্ব বাক্যের মর্ম অবধারণ করিতে পারিলেন না। সেইজন্য তিনি উপহাস পূর্বক বলিতে লাগিলেন, ‘হে প্রিয়ে! তুমি প্রলাপ বকিতেছ। দৃশ্যমান আকারবান্ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া যাহা আকারহীন এমন কোন বস্তু পাইয়াছ বলিয়া তুমি শ্রীমতী হইয়াছ—ইহা কি প্রলাপোক্তি নহে? যাহার কোন আকার নাই তাহা শূন্য। শূন্যের কোন শ্রী বা শোভা আছে নাকি? কেহ কেহ কোন কারণে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া বলে যে, ভোগ ত্যাগ করিয়া বা যান-বাহন-শয্যাাদি ত্যাগ করিয়া পরিতুষ্ট আছে। সেই ক্রুদ্ধ ব্যক্তির আবার শোভা কি? যদি কোন ব্যক্তি সর্বত্যাগী হইয়া আকাশে থাকিয়া সুখ বোধ করে, তবে উহা পিশাচতুল্য স্থিতি—তাহাতে কি শোভা আছে? কেহ কেহ শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করিতে পারে—ইহা তাহার ধৈর্য্যবলের পরিচায়ক

বটে, কিন্তু ইহা শোভাধিক্যের কারণ হইতে পারে না।' শিখিধ্বজ এইরূপ বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। চুড়াল এই সকল কথা শুনিয়া, তাঁহার পতি এখনও আত্মায় বিশ্বাস্তি লাভ করিতে পারেন নাই—এইজন্য একটু দুঃখিত হইলেন। বস্তুতঃ রাজা যে কেবল ব্রাহ্মী স্থিতিরূপ অবস্থা হইতে বহু নিম্নস্তরে অবস্থিত ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু চুড়ালার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধেও কোন সুস্পষ্ট ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই। যাহা হউক, এইরূপে বহু বর্ষ কাটিয়া যাইবার পর এক সময়ে চুড়ালার মনে আকাশভ্রমণের ইচ্ছা উদিত হওয়ায় খেচরত্ব-সিক্কির জন্ত যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আত্মা নিষ্ক্রিয়স্বভাব, কিন্তু কোন সিদ্ধিই ক্রিয়া ভিন্ন নিষ্পন্ন হয় না, তবে কাহার ক্রিয়ায় সিদ্ধি উৎপন্ন হয়? তারপর দেখা যায়—যাহারা কোন যোগসিদ্ধি লাভ করে, তাহাদের মধ্যে আত্মজ্ঞ (জ্ঞানী) লোকও আছে, অনাত্মজ্ঞ লোকও আছে (অর্থাৎ যে ব্রহ্মনিষ্ঠ নহে তাহারও যোগসিদ্ধি হয়)। বিরূপ ব্যক্তির সিদ্ধিলাভ করে?

বশিষ্ঠদেব বলিলেন,—সাধ্যবস্তু আত্মজ্ঞানের বা সুখ-সাধনের অনুরূপ হইলে উপাদেয়, প্রতিকূল হইলে হেয়; হেয় উপাদেয় কিছুই না হইলে উপেক্ষ্য। যাহাদের জ্ঞান জন্মে নাই, তাহাদের পক্ষেই এইরূপ বিজ্ঞান জানিবে। জ্ঞানী সমস্তই আত্মদৃষ্টিতে দেখেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে হেয়-উপাদেয়-উপেক্ষ্য বলিয়া কিছু

থাকা অসম্ভব। তবে কদাচিৎ জ্ঞানীও কেবল লীলার জ্ঞাত উপেক্ষাবুদ্ধিতে যোগসিদ্ধি অবলম্বন করেন। সিদ্ধির পক্ষে চাই দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্য। তন্মধ্যে ক্রিয়া প্রধান, অস্ত্রগুলি সহকারী। চারিটির সমবায়ে শীঘ্র সিদ্ধি হয়, নতুবা বিলম্বে হয়। উদ্ভামর তন্ত্র ও যোগিনীসাধক প্রভৃতি গ্রন্থে গুটিকা-সিদ্ধি, অঞ্জন-সিদ্ধি, পাছুকা-সিদ্ধি, খড়া-সিদ্ধির উপায় বর্ণিত আছে। এইগুলি জ্ঞান-সাধনায় বিঘ্নকর, সুতরাং দোষযুক্ত। রত্ন, ওষধি, তপস্যা ও মন্ত্রের দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হয়, কিন্তু এগুলিও জ্ঞান-সাধকের পক্ষে বিঘ্নকর। সিদ্ধি লাভের জ্ঞাত উৎকৃষ্ট উপায় পবনাভ্যাস অর্থাৎ প্রাণায়াম—বাহ্য যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত। রাজ্য হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত যে কোন সম্পদ প্রাণবায়ু জয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেহাভ্যন্তরে সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রাণস্বরূপ এবং পরিচালকস্বরূপ কুণ্ডলিনী-শক্তি আছেন—ইহাকে পরা শক্তি বা চিৎশক্তিও বলা হয়। যোগসিদ্ধির মূল এই স্থানে। চিৎ-পদার্থ সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত বটে, কিন্তু স্থাবরাদি অপেক্ষা মনুষ্য-শরীরে ইহার অভিব্যক্তি অধিক এবং দেহস্থ কুণ্ডলিনীতে ইহার ক্রিয়া সমধিকরূপে বিद्यমান। কুণ্ডলিনীই ক্রিয়াভেদে জীব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি বহু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কুণ্ডলিনী-শক্তিই মনোবুদ্ধিরূপ সূক্ষ্মদেহে অহংভাব স্থাপন করেন। ধূমের মধ্যে যেমন সূক্ষ্মরূপে জ্যোতিঃ থাকে, সেইরূপ কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে নিয়ত জ্ঞানশক্তি ফুটু হয়, এবং তৎফলে যোগী ইচ্ছামত পাষণ, পর্বত, তৃণ,

জল, ভূতল, আকাশ সর্বত্র প্রবেশ ও বিচরণ করিতে পারে। জীবের পরমাশ্রয় প্রাণনামিকা কুণ্ডলিনী-শক্তি সহযোগে অগ্নিমা, লঘিমা, আকাশগতি, ইত্যাদি বিবিধ সিদ্ধি লাভ হয়। প্রাণের চাঞ্চল্যে আধিব্যাধির উৎপত্তি, প্রাণের সাম্যবশতঃ যোগী আধিব্যাধিমুক্ত।

অষ্টাঙ্গযোগে এইরূপ সিদ্ধিলাভ হয়। আবার জ্ঞানযোগেও দৃষ্টি শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম হইলে সিদ্ধিলাভ হয়। জগতে অতি সূক্ষ্ম, নিরাময়, শান্তস্বরূপ চিংই একমাত্র সদ্বস্ত। চিংই মায়াবশে ‘আমি বহু হইব’ ইত্যাকার সঙ্কল্প দ্বারা আপনি আপনাকে অধ্যস্ত করিয়া ‘জীব’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভ্রান্তিকল্পনা বশে শরীর সন্দর্শন করে। ‘আমি সর্বব্যাপী, নিরঞ্জন, চিন্মাত্রস্বরূপ’ ইত্যাকার জ্ঞানের প্রকাশে আর ঐ ভ্রমরূপ দেহ সন্দর্শন হয় না। দৃঢ় ভাবনার দ্বারা বিষ অমৃতের, অমৃত বিষের কার্য্য করে। ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে,—যাহাতে জানা যায় যে মূঢ় জনেরাও যাহা যেরূপে ভাবনা করে তাহা তদাকারে প্রাপ্ত হয়। দেহকে সত্যবুদ্ধিতে দেখিলে উহা দেহ, মিথ্যাবুদ্ধিতে দেখিলে এই দেহই ব্রহ্মকাশরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জ্ঞানযোগীর সর্ব-সিদ্ধি করায়ত্ত হইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ এই সকল সিদ্ধিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মপদকেই একমাত্র অবলম্বনীয় মনে করেন।

যাহা হউক, চূড়াল তীত্র সম্মুখে অবলম্বন পূর্বক পবনাভাস দ্বারা অগ্নিমাди অষ্ট যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিলেন। তিনি কখনও

আকাশমার্গে গমনাগমন করিতেন, কখনও সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিতেন, কখনও ভূমণ্ডল পরিক্রমণ করিতেন। যুক্তার মধ্যে যেমন সূত্র প্রবেশ করে, তিনি সেইরূপ কাষ্ঠে, তৃণে, প্রস্তরে এবং ক্ষিতি-অপু-তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূতে অনায়াসে প্রবেশ করিতেন। দেবগিরি সুমেরুর উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে, ইন্দ্রাদি দেবগণের অধ্যাসিত স্বর্গে ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে তিনি যথেষ্ট বিচরণ করিতেন। তিনি পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী এবং দেবতা, অঙ্গুরা, সিদ্ধগণ প্রভৃতির সহিত আলাপ ব্যবহার করিতেন। এইরূপ যোগৈশ্বর্যশালিনী হইয়াও তিনি সম্পূর্ণ নিলিপ্তা ছিলেন। আবার তিনি এতদূর পতিব্রতা ছিলেন যে, যোগবলে এক মুহূর্তের জন্যও পতির বক্ষঃ ও হৃদয় হইতে বিযুক্ত হইতেন না এবং যাহাতে পতির জ্ঞান লাভ হয় সর্বদাই তদনুরূপ প্রবোধ দিতেন। শিখিধ্বজ কিন্তু সেই সকল উপদেশের মর্ম বুঝিতেন না—তিনি মনে করিতেন চূড়াল। তাঁহার সেই নৃত্যগীতকুশলা স্ত্রীই আছেন। উচ্চবিদ্যার মহিমা বুঝিতে যেমন একটি বালক সমর্থ হয় না, সেইরূপ শিখিধ্বজ তখনও চূড়ালকে বুঝিতে পারেন নাই। চূড়াল।ও তাঁহার মহাযোগৈশ্বর্য শিখিধ্বজকে দেখান নাই।

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন—‘ভগবন, মহা-যোগৈশ্বর্যশালিনী চূড়ালার চেষ্টায়ও যখন শিখিধ্বজের জ্ঞানোৎপত্তি হইল না, তখন অন্যের পক্ষে জ্ঞানলাভের ভরসা কি?’ বশিষ্ঠদেব বলিলেন—‘উপদেশানুসারে ফলপ্রাপ্তি অনুষ্ঠানসাপেক্ষ।

গুরু উপদেশের সফলতা-বিফলতা শিষ্যের উত্তম বা মন্দ বীশক্তির উপর নির্ভর করে। কেবল বেদাধ্যয়ন বা পুণ্যকর্ম দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মে না। আত্ম দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

রামচন্দ্র বলিলেন,—‘হে মুনিবর, আমরা ত’ শুনিয়াছি—
গুরু-পরম্পরাক্রমে উপদেশ দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হয়।’

বশিষ্ঠদেব ইহার উত্তরে একটি উপাখ্যান বলিলেন।
বিক্কারণ্যে বহুধনশালী কিন্তু অত্যন্ত কুপণ একজন বণিক বাস করিত। এক সময়ে বনমধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তাহার একটি কপর্দক (কড়ি) নীচে পড়িয়া গেল। জঙ্গলের মধ্যে সেই কড়িকড়াকে বাহির করিবার জন্য সে তিনদিন অতিবাহিত করিল। সে আপন মনে ভাবিতেছিল—কড়ি হারাইয়া সে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কারণ এক কড়া হইতে চার, চার হইতে আট, আট হইতে একশত, একশত হইতে এক হাজার কড়ি লাভ হইতে পারিত। তিনদিন পরিশ্রমের পর চন্দ্রের স্থায় উজ্জ্বল একটি চিন্তামণি তাহার হস্তগত হইল। মণি লাভ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া আসিল এবং শাস্তুচিন্তে কালক্ষেপ করিতে লাগিল।

অতএব সামান্য বস্তুর জন্যও অধ্যবসায় করিলে বহু ফল লাভ হইতে পারে। বেদাধ্যয়ন দ্বারাই যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়—এরূপ কোন কার্য্য-করণ সম্ভব নাই। কারণ, ব্রহ্ম বেদাদিরও অগোচর। কেহ অল্পাধিক অনুসন্ধান দ্বারা, কেহ বা গুরু হইতে জ্ঞানলাভ করে। গুরুপদেশ বিনা জ্ঞানলাভ হয় না

সত্য, কিন্তু তৎসহ ~~নিজের~~ নিজের একান্ত চেষ্টা চাই। চেষ্টা বিনা সফলতা হয় না—যেমন কপর্দক অন্বেষণ বিনা মণিলাভ হয় নাই। আবার এই দৃষ্টান্ত হইতেই জানা যায় যে, কখন গুরুর উপদেশ বিনাও জ্ঞানলাভ হয় ; অর্থাৎ অকারণও কোন কোন সময়ে সকারণ হইয়া থাকে—যেমন কড়ি খুঁজিতে খুঁজিতে লাভ হইল মণি।

যাহা হউক, পরবর্তী ঘটনায় দেখা যায় যে, শিখিধ্বজের প্রতি চূড়ালার নিরন্তর প্রবোধবাণী একান্ত নিষ্ফল হয় নাই—একটু বিলম্বে সফলই হইয়াছিল। কালক্রমে মহারাজ শিখিধ্বজের চিত্তও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া শোকাচ্ছন্ন হইল। তিনি এই অভাবটি এতদূর তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন যে, অতুল রাজৈশ্বর্যকেও তিনি অঙ্গসংলগ্ন অগ্নিশিখার ন্যায় অসহনীয় বোধ করিয়া বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। শিখিধ্বজ মহাদাতা ছিলেন—দেবতা ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়বর্গকে বহু গো, ভূমি ও সুবর্ণাদি দান করিয়াছিলেন। তিনি চান্দ্রায়ণাদি দ্বঃসহ তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, পবিত্র তীর্থ, বন ইত্যাদি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা দ্বারাও শেষে তিনি সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই,—যেমন নিধিলাভেচ্ছু ব্যক্তি নিধিহীন প্রদেশ খনন করিয়া নিধির অপ্রাপ্তিহেতু সন্তোষ লাভ করিতে পারে না। শিখিধ্বজ ভবব্যাধির আরোগ্যকর ঔষধ না পাইয়া ক্লেশতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তিনি চূড়ালাকে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—

‘আমি বহুকাল রাজ্য ভোগ করিয়াছি, এক্ষণে উহাতে আর আমার স্পৃহা নাই। আমি বনগমনে উত্তত হইয়াছি—মুনিগণ সহ শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিব, ইহাই আমার ইচ্ছা। তুমি ইহাতে আপত্তি করিও না। সতী স্ত্রীগণ স্বপ্নেও পতির ইচ্ছায় বাধা প্রদান করেন না।’

চুড়াল এই মর্মে বলিলেন—‘মহারাজ, আপনার বনগমনের সময় এখনও হয় নাই। অনুচিত সময়ে কৃত কার্য আশানুরূপ ফলোৎপাদন করে না। আপনার বর্তমান কর্তব্য—প্রজা পালন। কর্তব্য না করিয়া অযোগ্য সময়ে বনবাস করিলে পাপ হইবে।’

শিখিধ্বজ বলিলেন—‘তুমি বাধা দিও না। আমি অতি দূরবর্তী কোন বনে চলিয়া যাইব মনঃস্থ করিয়াছি। তুমি তথায় বনবাস-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে না। তুমি রাজ্যেই থাক। পতির অনুপস্থিতিতে কুটুম্ব প্রতিপালন-ভার বহন করা নারী-গণের ব্রত।’

রাজা এই কথা বলিয়া দিনকৃত্য করিতে চলিয়া গেলেন। রাত্রি আগত হইল। যথাসময়ে শিখিধ্বজ ও চুড়াল একশয্যায় শয়ান হইলেন। গভীর রজনী—চুড়াল নিদ্রাভিভূত। শিখিধ্বজ শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন, চুড়ালকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন এবং রাজলক্ষ্মীদেবীকে নমস্কার করিয়া পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি চলিয়া প্রাতঃকালে এক গভীর অরণ্যমধ্যে উপস্থিত

হইলেন, তথা হইতে আরও দূর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বাদশ রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। তৎপর তিনি একান্ত জনশূন্য মন্দার পর্বতের বনভূমিতে আগত হইলেন এবং জলপ্রপাতযুক্ত প্রাণধারণযোগ্য ফলসম্বিত বৃক্ষরাজিশোভিত একটি স্থান মনোনীত করিয়া তথায় পর্ণরচিত উটজ নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাপসোচিত আচার-ব্যবহার অবলম্বন পূর্বক বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে চুড়াল জাগ্রত হইয়া দেখিলেন—পতি শয্যায় নাই। তিনি হঃখিত হইলেন এবং উৎসাহশূন্য ও বিমনায়মানা হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া ভাবিলেন—রাজ্য যে কিরূপ ক্লেশজনক, পতি ইহা অনুভব করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শিখিন্ধজ যে বনগমন করিয়াছেন, তাহাতে চুড়ালার কোন সন্দেহ হইল না। পতির অনুগমন করাই জীবর কর্তব্য—এইরূপ ভাবিয়া তিনিও বনগমনে ইচ্ছা করিলেন। চুড়াল আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, এবং উপর হইতে বনপ্রদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক—পতি কোথায় আছেন—তাহার সন্ধান লইতে লাগিলেন। অবিলম্বে তিনি দেখিতে পাইলেন—শিখিন্ধজ এক বিজন বনস্থলে তপস্বিবেশে অবস্থান করিতেছেন। আকাশপটে থাকিয়াই তিনি স্থির করিলেন যে, তাহার পতির ভবিতব্যতাই এইরূপ, সুতরাং এক্ষণে তাহার অবস্থার কোন পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি যে সময় হইলে পুনরায় পতিপার্শ্বে বিরাজ করিবেন তাহাতেও তাহার

মনে কোন সংশয় রহিল না। চুড়ীলা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং মহারাজ শিখিধ্বজ প্রয়োজনবশে অন্ত্র গিয়াছেন, কার্য্যশেষে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবেন—এই কথা বলিয়া উদ্বিগ্ন পৌরজনকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক সকলকে স্ব স্ব যথা-নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করিতে আদেশ করিলেন।

(২)

এইরূপে অষ্টাদশ বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে, শিখিধ্বজ এক্ষণে বার্কাক্যদশায় উপনীত হইয়াছেন, এবং মন্দার শৈলেই তপশ্চরণ করিতেছেন। চুড়ীলা এক্ষণে সময় হইয়াছে অর্থাৎ শিখিধ্বজ এতদিনে সম্পূর্ণ কামনাবর্জিত হইয়া একমাত্র ব্রহ্মানন্দেই স্থিত হইয়া তাহারই সমধর্ম্মা ও সমচিন্তবান্ হইয়াছেন—এইরূপ স্থির করিয়া পতির সংবাদ লইতে উদ্ধাক্ত হইলেন। তিনি আকাশমার্গে উখিত হইয়া বহু দেশ, কান্তার, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মন্দার শৈলে উপনীত হইলেন। তিনি নভোদেশে থাকিয়াই পর্ণোটজে অবস্থিত পতিকে দেখিতে পাইলেন। শিখিধ্বজকে দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, পতি ধ্যানাবলম্বী হইয়াছেন বটে, কিন্তু এক্ষণে তিনি যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তবে তিনি এক্ষণে পরিপক্বমতি বিকল্প-রহিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্য পাত্র হইয়াছেন। চুড়ীলা স্থির করিলেন সেইদিনই সেই স্থানেই তিনি পতিকে ভোগ ও মোক্ষ কি তাহা নিবেদন করিবেন। কিন্তু পত্নীরূপে কিছু বলিলে

তাহার কথা পতি উপেক্ষা করিতে পারেন—এইজন্ত তিনি এক তপস্বী দ্বিজ-বালকের রূপ ধারণ করিয়া শিখিধ্বজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বালক যেন নিজ জ্যোতিঃতে মন্দার পর্বত উদ্ভাসিত করিতেছিলেন। শিখিধ্বজ বালককে দেখিয়াই মনে করিলেন—ইনি সুরলোক হইতে আগত কোন দেবকুমার হইবেন। তিনি গাত্রোত্থান পূর্বক বালককে নমস্কার জানাইয়া উপবেশনार्থ আসন প্রদান করিলেন। বালক, ‘হে রাজর্ষে ! আপনাকে নমস্কার’ বলিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। শিখিধ্বজ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে মহাভাগ ! আপনি কোথা হইতে আসিলেন ? আপনার দর্শনলাভে আজ আমার দিনটা সফল হইল মনে করিতেছি। আমার নিবেদিত এই পাণ্ড অর্ঘ্য, পুষ্পসকল গ্রহণ করুন।’

জ্যোতির্ময়বপু দ্বিজ-বালকরূপিণী চূড়ালী বলিলেন,—‘আমি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু আপনার আন্তরিকতাপূর্ণ পূজা আর কোথাও পাই নাই। আপনি দীর্ঘজীবী হউন। আপনি যখন রাজ্য-ঐশ্বর্য্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া মহাবনে আসিয়া কঠোর তপশ্চরণ করিতেছেন, তখন আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে বিলম্ব নাই।’

শিখিধ্বজ।—আপনি দেখিতেছি আমার সম্বন্ধে সবই জ্ঞানেন। আশ্চর্য্যই বা কি ! আপনার বুদ্ধি লোকোত্তর, তাহাতে সমস্তই বুঝিতে পারেন। আমার পত্নী এক্ষণে রাজ্য রক্ষা করিতেছেন। দেখিতেছি—আপনার অঙ্গসৌষ্ঠব তাহারই

শ্রায়—আপনি তাঁহারই মত সুন্দর ও শাস্ত। যাঁহা হউক, অতিথি-সেবার অবসর পাইয়া আজ আমার জীবন সফল হইল।
 এক্ষণে—আপনি কে, কাহার পুত্র, কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন—বলুন।

চুড়াল।—আপনার শ্রায় বিনীত পুরুষ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতেই হয়। আমার উৎপত্তি-বিবরণ বলিতেছি, শুনুন—

একদা নারদমুনি পর্বতকন্দরে ধ্যান করিতেছিলেন। নিকট প্রবাহিণী জাহ্নবী-জলে অকস্মাৎ শব্দ হইতেছে শুনিয়া তিনি উহার কারণ জানিবার জন্য উৎসুকচিত্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—রম্ভা, তিলোত্তমার শ্রায় কান্তিমতী দেবাজ্ঞনাগণ নগ্ন অবস্থায় জলকেলি করিতেছে। সহসা মহাত্মা নারদের বিবেক-বৃত্তি মোহাচ্ছন্ন হওয়ায় চিত্তবিকার উপস্থিত হইল—তিনি যেন কুজাটিকাচ্ছন্ন চন্দ্রের শ্রায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। চিত্ত-চাঞ্চল্য বশতঃ তাঁহার চরম ধাতু ক্ষরিত হইল।

শিখিধ্বজ।—জীবনুজ্ঞান নিষ্পাপ মহামুনি নারদও ধৈর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন—ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

চুড়াল।—হে রাজর্ষে! জগতে দেব-নর-পশু—সকলেই স্ব স্ব প্রকৃতির অধীন। জগৎ সুখ-দুঃখময়। যাহার যাহাতে তৃপ্তি, সে তাহার বশীভূত হয়। ভিন্ন ভিন্ন লোকের চিত্তানুসারে বিষয়-জ্ঞান সুখ-দুঃখ বা উহার তারতম্য হয়। অন্ধকার যেমন আকাশকে আবৃত করে, সেইরূপ নির্মল সত্যের স্মৃতিভ্রংশ

হইলে স্বভাব বলবান্ হইয়া চিত্তকে কলুষিত করিয়া ফেলে।
 যাহাতে চিত্ত আকৃষ্ট হয় তাহাতেই লোকের উল্লাস হয়। মণি
 যেমন সমীপবর্তী বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, নারদমুনি জীবমুক্ত
 হইয়াও তাঁহার চিত্ত সেইরূপ তৎকালীন পুরোবর্তী দৃশ্যের ভাবে
 অভিভূত হইয়াছিল বলিয়া ঐ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিখিধ্বজ।—হে প্রভো! সুখ-দুঃখের উৎপত্তি কিরূপে
 হয়—আপনি তাহা বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

চূড়াল।—সুখের উৎপত্তি নাই। সুখ আত্মগত। একমাত্র
 আত্মাই সুখস্বরূপ। সুখের অবির্ভাব-তিরোভাব হয় বটে,
 কিন্তু তাহা বুদ্ধিজ্ঞ। যে ব্যক্তি আত্মসুখের অভিজ্ঞতা লাভ
 করে নাই, সে ইন্দ্রিয় বা মন দ্বারা কোন হ্রদ বস্তু অনুভব
 করিয়া আপনাকে সুখী মনে করে। জীবের যে নাড়ীপথে
 সঞ্চরণ, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সেইজন্য জীব
 বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন প্রকারের সুখ-দুঃখ ভোগ করে। আবার
 এক ব্যক্তির যাহাতে সুখ হয়, তাহাতেই অন্য ব্যক্তির দুঃখ
 হয়। শান্তি সম্বন্ধেও সেই কথা। প্রকৃত পক্ষে শান্তিই
 সুখ। যতক্ষণ শান্তি, ততক্ষণ সুখ। অশান্তির সুখ নাই।
 তৈলশূন্য প্রদীপ যেমন ধীরে ধীরে উপশম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ
 চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইলে চিদাকাশ যখন ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে
 অনুভূত হয়, তখনই শান্তি। সেই সমতা বা বিশ্রান্তিরূপ
 শান্তিই সুখস্বরূপ এবং মুক্তিস্বরূপ। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে দ্বৈতবোধ
 এবং জীবতত্ত্ববুদ্ধি দূরীভূত হইয়া যায়। সর্বজীবের আদি জীব

হিরণ্যগর্ভ। আদিতে তিনিই 'অহং' বোধ অবলম্বনে সংসারী হন, আবার 'নাহং' বোধ অবলম্বনে মুক্ত হন। সেইজন্য তাহা হইতে জাত সর্ব জীবেরই 'অহং' বোধরূপ ভ্রমধারা অক্ষুণ্ণভাবে চলিতেছে।

শিখিধ্বজ।—সুখ-সঞ্চরণের নাড়ীপথে সাধারণ জীবমাত্রের বিচরণ করে সত্য; কিন্তু দেবর্ষি নারদের ঐরূপ দশা কিরূপে হইল?

চুড়াল।—অনুভূত বা উপভুক্ত বিষয়ের সংস্কার চিত্তে আশ্রিত থাকে, এবং অতীত সময়ে প্রসুপ্ত অবস্থায় থাকিলেও উত্তেজক কারণযোগে উদ্বুদ্ধ হয়। অঙ্গনাদর্শনে জীবের পূর্বের রাগ-সংস্কার উত্তেজিত হয়। তাহাতে জীবের চিত্তে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। চাঞ্চল্যফলে দেহস্থ বায়ু বিচলিত হয়। ইহা অতিমাত্রায় হইলেই চরম ধাতু শিরাপথে অধোদিকে ধাবিত হয়, যেমন বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া পুষ্পাদির সুগন্ধ পুষ্প হইতে বাহির হইয়া যায়, বা মেঘ হইতে বর্ষণ হয়।

শিখিধ্বজ।—আপনি সর্বতত্ত্বই অবগত আছেন। আমাকে বলুন—স্বভাব কাহাকে বলে, স্বভাব কথাটার অর্থ কি?

চুড়াল।—সৃষ্টির আদিতে যে বস্তু যে বিশেষ গুণসম্পন্ন হইয়া সৃষ্ট হইয়াছিল, প্রলয় পর্য্যন্ত সেই বস্তুর সেইরূপে সম্পন্ন হওয়ার একটি নিয়ম আছে—এই নিয়মটি স্বভাব শব্দের অর্থ। এইটি ঘট, এইটি পট—এইরূপে বর্তমান সময়ে বস্তুর যে স্বভাববৈচিত্র্য দেখা যায়, তাহার মূলে রহিয়াছে ঐ নিয়ম।

আপনি এই স্বভাবকেও মায়াবিশেষ বলিয়া জানিবেন। স্বভাব জগতে রূঢ়ভাবে রহিয়াছে, এবং স্বভাববশেই জীবগণ অজ্ঞান ভ্রান্তিতে আবৃত হইয়া আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞান লাভ করিয়া জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে। আত্মজ্ঞানীর পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণ হয়। ? নিখিল জগৎ আত্মস্বভাববশেই সৃষ্ট বা বাসনা-পরিচালিত হয়।

শিখিধ্বজ।—হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ। আপনার অপূর্বার্থ ও অমৃততুল্য বাক্যবিজ্ঞাসে আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার জন্মবৃত্তান্ত বলুন।

চূড়ামা।—নারদমুনি প্রোক্ত অবস্থান্তর হওয়ার পরেই আবার বিবেকরূপ আলানে (স্তুভে) সুবুদ্ধিরূপ রজ্জু দ্বারা মনোরূপ হস্তীকে সংযত করিয়া তাঁহার অমোঘ বীৰ্য্য পার্শ্বস্থিত একটি সুদৃঢ় ফটিককুস্তুর মধ্যে স্থাপন করিলেন। কিছুদিন পরে উহাতে জীবসঞ্চার হইল, এবং যথাকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত একটি শিশুর জন্ম হইল। কুস্ত হইতে জাত বলিয়া শিশুর নাম হইল 'কুস্ত'। বাল্যে উপনীত হইলে সর্বসংস্কার-সম্পন্ন কুস্তকে নারদ সমস্ত বিজ্ঞা অর্পণ করিলেন। অল্পকালমধ্যেই বালক নিখিল বাঙ্গয় শাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিলেন। একদিন নারদ নিজ পুত্রকে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্বক নিজ পিতা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। ভগবান ব্রহ্মা সাদরে পৌত্রকে অঙ্কে স্থাপন পূর্বক আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন যে, বালক সর্বশাস্ত্র পারদর্শী হইল। আমি প্রজাপতির পৌত্র সেই

‘কুন্ত’। আমি পিতৃসহ ব্রহ্মলোকে বাস করি, গায়ত্রী দেবী আমার মাসী এবং স্বয়ং সরস্বতী আমার মা। আমি ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করিতে পারি। আকাশ পথে যাইতে যাইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

(এস্থলে চুড়াল যে নিজ জন্মবৃত্তান্ত বলিলেন—তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক হইতে পারে। কারণ সেই জন্মে তিনি সৌরাষ্ট্র রাজহুহিতা ছিলেন। কিন্তু তত্ত্বদর্শিনী চুড়ালার চক্ষে জীবের জন্ম-মৃত্যুরূপ সৃষ্টিপ্রবাহই কল্পনা মাত্র। যিনি ব্রহ্মাত্মজ্ঞান-সম্পন্ন, ব্রহ্মতাদাত্ম্যহেতু তিনি সর্ব্বগত বলিয়া তাঁহার পক্ষে নিজেকে কুন্ত বা অন্য কিছু বলিয়া পরিচয় দানেও তত্ত্বদৃষ্টিতে অসামঞ্জস্য নাই।)

শিখিধ্বজ।—আপনি যে আজ এখানে আসিলেন—ইহা আমার বহু পুণ্যের ফল। সাধু সমাগমে আমার যেমন আনন্দ হয়, রাজ্যলাভেও তাহা হয় না। অনন্ত সুখের তুলনায় বিষয় সুখের কল্পনা কেবল কল্পনা মাত্র। আপনার দর্শনলাভে আজ আমি মনে করিতেছি যেন ধার্মিকগণের অগ্রণী হইয়াছি।

চুড়াল।—আর এ সকল কথায় কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আপনি বলুন—আপনি কিসের জন্ম এবং কতদিন এই গিরিকন্দরে বাস করিতেছেন।

শিখিধ্বজ।—হে দেবকুমার! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আমার সম্বন্ধে সমস্তই আপনি জ্ঞাত আছেন। আমার নাম শিখিধ্বজ। আমি জন্ম-মরণশীল সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া অরণ্য আশ্রয়

করিয়াছি। আমি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছি, কিন্তু অত্যাপি শান্তিলাভ করিতে পারি নাই। অতএব যতই দুঃখকর হউক, আমি বনে বাস করিতে থাকিব এবং তপস্যা হইতে বিরত হইব না।

চুড়ীলা।—আমি এক সময়ে পিতামহ ব্রহ্মাকে জ্ঞান ও কর্মমধ্যে শ্রেয়স্কর কোন্টি—জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়। অতএব জ্ঞানই পরম লভ্য বস্তু। কর্মানুষ্ঠান কেবল কালযাপন করিবার জন্ত বা চিত্তবিনোদন করিবার জন্ত। তবে জ্ঞানদৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের কর্মই একমাত্র আশ্রয়। কর্মী বাসনানুরূপ বস্তু লাভ করিলেই কর্ম সফল হইল মনে করে। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তি বাসনাক্ষয়ই ইচ্ছা করেন; সেইজন্য তিনি সমস্ত ক্রিয়াই অফল মনে করেন। কর্ম যত বড়ই হউক না কেন, উহা চরম বা বহুফল উৎপাদন করিতে পারে না। কর্তৃত্ববুদ্ধি ব্যতীত কর্ম হয় না; সেইজন্য অহঙ্কারাত্মক বাসনা কখন বিলুপ্ত হয় না। যিনি সমস্তই ব্রহ্মময় দেখেন, তাঁহার চিন্তে বাসনার উদয় হয় না, যেমন মরুভূমিতে সমুদ্রের উৎপত্তি হয় না। বাসনায়ুক্ত চিত্তকেই ‘মন’ বলিয়া জানিবেন এবং মন বাসনায়ুক্ত হইলেই ‘জ্ঞান’ নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে জীব জন্ম-মরণ হইতে পরিভ্রাণ লাভ করে। অজ্ঞানমূলক কর্মদ্বারা তাহা হয় না। মহারাজ! আমি দেখিতেছি আপনি অজ্ঞানপথে চলিয়াছেন। দণ্ড, কমণ্ডলু, কস্মা—এই সকল ধারণ করিলেই

শ্রেয়ঃ লভ্য হয়,—আপনি এই অনর্থ চিন্তায় কেন ক্লিষ্ট হইতেছেন ? আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কিসে বন্ধন হয়, কি উপায়ে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়—তাহাই চিন্তা করুন। এইরূপ আত্মচিন্তা দ্বারা যাহারা সংসার-সাগর পার হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদের পথানুবর্তন কেন করিতেছেন না ? ব্রতোপবাসাদি দ্বারা আপনি এই বনমধ্যেই বাস করিবেন স্থির করিয়াছেন—কিন্তু ইহা ত' প্রস্তরের মধ্যস্থ একটি কীটও করিয়া থাকে। যাহারা তত্ত্বদর্শী সাধু, সজ্জন, আপনি তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা দ্বারা নিজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করুন।

শিখিধ্বজ (আনন্দাশ্রপূর্ণ নেত্রে)।--আপনার কথা শুনিয়া আমি প্রাণে আনন্দ অনুভব করিতেছি। হে দেবকুমার ! আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম। সাধুসমাগমই মোক্ষের উপায় বলিয়া আমি অবধারণ করিলাম। আপনি যে আমাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন, ইহাতেই মনে হইতেছে আমার সর্বপাপ বিধোত হইয়া গিয়াছে। আপনি আমার পূজ্য গুরু। শিষ্যের প্রণাম গ্রহণ করুন। হে ভগবন্, আপনার প্রশংসিত একমাত্র যে জ্ঞানই, কৈবলামুক্তির উৎপাদক, সেই জ্ঞান কিরূপ, বলিলে কৃতার্থ হইব।

• চুড়াল।—আর্য্যগণসেবিত সেই তত্ত্বমার্গ আপনাকে বলিতেছি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন। অশ্রদ্ধার সহিত শ্রবণে কোন ফল হইবে না।

শিখির্ধ্বজ ।—আপনার বাক্য আমি বেদবিধির গ্রায়
অবিচারিত ভাবে, কোন তর্কযুক্তির অপেক্ষা না করিয়াই গ্রহণ
করি—এ বিষয়ে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি ।

চূড়লা ।—আপনাকে একটি উপাখ্যান বলিতেছি । ইহাতে
সংসার-ভীতিনাশন মোক্ষপদ লাভের উপায় জানা যাইবে ।
বিবিধ পুণ্যের আধার শ্রীমান্ পুমান নামে এক ব্যক্তি ছিলেন ।
তিনি কলাবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, ব্যবহার-শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে
পারদর্শী ছিলেন । কিন্তু তাঁহার চিত্ত বাসনাপূর্ণ থাকায় তিনি
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই । তিনি চিন্তামণি (এক
প্রকার মহার্ঘ মণি) লাভার্থ ইচ্ছুক হইয়া দুঃচর তপস্যা আরম্ভ
করিলেন । তপস্যার তীব্রতাবলে শীঘ্রই চিন্তামণি সিদ্ধ হইয়া
তাঁহার পুরোভাগে উপস্থিত হইল । চন্দ্রকলার গ্রায় উজ্জ্বল
চিন্তামণি তাঁহার সম্মুখে, কিন্তু তাঁহার সংশয় হইল—উহাই
বাস্তবিক চিন্তামণি কি না । তিনি দীন, দরিদ্র, তাঁহার ভাগ্যে
চিন্তামণিলাভ ঘটবে এবং অত্যন্ত সময়ের মধ্যে ঘটবে ইহা
তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না,—যেমন কোন ভিক্ষুক
অকস্মাৎ রাজপদে অভিষিক্ত হইলে সহসা বিশ্বাস করিতে পারে
না যে, সে রাজা হইয়াছে । মণিটিকে সেইরূপ চিন্তামণি মনে
করা তাঁহার আন্তি—পুমান এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মূর্ত্ত্যবশত
মণি ত্যাগ করিলেন । চিন্তামণিও উহার অবমাননাকারী সেই
পুরুষের নিকট হইতে অদৃশ্য হইল । পুমান চিন্তামণির জ্ঞা
আবার তপস্যা করিতে লাগিলেন—ইহা অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি-

গণের লক্ষণ বটে। এবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল একখানা অথগু কাচ। তিনি উহাকেই চিন্তামণি ভ্রমে আদর পূর্বক গ্রহণ করিলেন এবং ভাবিলেন এখন তিনি কাহারও কোন অপেক্ষা না করিয়া সর্বসম্পদ লাভ করিতে পারিবেন। এইরূপ মনে করিয়া দেশ ও বন্ধুবর্গ ত্যাগ করিয়া নিবিড় বনমধ্যে চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই অজ্ঞতা নিবন্ধন অচিরে তিনি নানা প্রকারে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। অতএব অজ্ঞতা, সংশয়, অজ্ঞানাই সর্ববিপদের মূল।

(৩)

চুড়াল। বলিতে লাগিলেন—আরও একটি উপাখ্যান বলিতেছি, শুনুন। বিদ্যারণ্যে এক মহাবলশালী যুথপতি হস্তী বাস করিত। অমিত বলশালী মহাকায় সেই হস্তী সম্পূর্ণরূপে হস্তিপকের (মালতের) বশতাপন্ন হইয়া চলিত। তিন দিন লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায় থাকায় হস্তীর অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছিল এবং সে বারম্বার যন্ত্রণাসূচক নাদ করিতেছিল। সেই মদমত্ত হস্তী দন্ত দ্বারা শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। হস্তিচালক দূর হইতে ইহা দেখিয়া একটি বৃক্ষে চড়িয়া তথা হইতে লক্ষ্যপ্রদান পূর্বক হস্তীর মস্তকে পতিত হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে হস্তীর মাথায় না পড়িয়া পদতলে পড়িয়া গেল। তাহার বন্ধনের মূল যে মালত ইহা জানিয়াও হাতী উহার কোন হানি না করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। মালত অনুসন্ধান

করিতে করিতে দেখিতে পাইল যে, হাতী একটা জঙ্গলের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছে। মালত নিকটেই হাতি-ধরা একটা গভীর খাত নির্মাণ করিল এবং উহা লতাপুষ্পাদি দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিল। ইহা যে তাহার বন্ধন-ফাঁদ—হাতী ইহা বুঝিতে না পারিয়া সেই গভীর গর্তমধ্যে পড়িয়া গেল এবং আর উঠিতে পারিল না। ইহা হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, যাহারা সম্মুখস্থ বিঘ্ন নাশ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য উপায় অবলম্বন না করে, তাহাদিগকে বহু কষ্টভোগ করিতে হয়। অজ্ঞানই বন্ধন। আত্মজ্ঞান দ্বারা উহা নাশ করিতে হইবে, নতুবা মুক্তি নাই। সৰ্ব্বাত্মজ্ঞান দ্বারা ‘সমস্তই ব্রহ্মময়’—এইরূপ ভাবনা হইতেই মুক্তিলাভ হয়।

শিখিধ্বজ।—হে দেবনন্দন। আপনি আর একবার মণিসাধক ও বিদ্যা হস্তীর উপাখ্যান হইতে লভ্য উপদেশ বিষয়ে আমাকে বলুন।

চূড়ামণি।—যিনি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভে বঞ্চিত, তাহাকেই মণিসাধক জানিবেন,—অর্থাৎ তিনি কাচ পাইয়া চিন্তামণি ত্যাগ করেন। মহারাজ! আপনি সৰ্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু এখনও তত্ত্বজ্ঞানহীন। চিন্তামণি পাইতে হইলে সৰ্ব্ববিষয়েই তুচ্ছবুদ্ধি হওয়া আবশ্যক। আপনি রাজ্য-ধন ইত্যাদি সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন বটে, তথাপি আপনার এই সৰ্ব্বস্বত্যাগে আমি সুখী নহি, বরং দুঃখিত। কারণ, আপনার ত্যাগ জ্ঞানমূলক নহে। জ্ঞানমূলক ত্যাগেই পরমানন্দস্বরূপ

ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। আপনার ত্যাগ ব্রহ্মনিশ্চয় দ্বারা ত্যাগ নহে বলিয়া আপনি সেই আনন্দের অধিকারী হইতে পারিতেছেন না। আপনার চিত্ত এখনও সংকল্প-বিকল্প দ্বারা বিভ্রান্ত বলিয়া উহা বাসনামুক্ত হয় নাই। আপনার বাহ্যবিষয়ের ত্যাগ খুব মহান্ বটে, কিন্তু আপনার অন্তঃকরণ হইতে আসক্তি দূর না হওয়ায় উহা সম্যক্ ফলদায়ক হইতে পারে নাই। বাসনা ত্যাগ পূর্বক জ্ঞানময় দৃষ্টি লাভ না করিয়া আপনি যে বাহ্য বিষয় ত্যাগকেই এবং দুঃখময় দুষ্কর তপশ্চরণকেই সারপদার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, ইহা ঠিক সেই মণিসাধকের প্রকৃত মণিকে ত্যাগ করিয়া কাচকে মণি ভ্রমে গ্রহণ করার ত্রায় হইয়াছে। অতএব এই নিবিড় বনমধ্যে যে আপনার আগমন, উহা অজ্ঞতা নিবন্ধনই জানিবেন। রাজ্যবন্ধন ত্যাগ করিয়া বনে আসিয়া আর একটি দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন।

অন্য উপাখ্যানে যে বিদ্যা-হস্তীর কথা বলিয়াছি সে অন্য কেহ নহে, আপনিই সেই হস্তী এবং যাহাকে হস্তিপক বলিয়াছি সে আপনার নিজেরই অজ্ঞান। হস্তিপক যেমন হস্তীকে এক দুঃখ হইতে অন্য দুঃখগহ্বরে ফেলিয়াছিল, অজ্ঞানতা সেইরূপ আপনাকে রাজ্যভোগরূপ এক বন্ধন হইতে বনবাসরূপ অন্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। শাস্ত্রদর্শন স্মরণ, কিন্তু ভোগাশা ত্যাগ দুষ্কর। আপনি বাহ্যভোগ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু ভোগাশা, ভোগানুরাগ ত্যাগ করিতে পারেন নাই! কেবল বনবাস আশ্রয় করিলেই তাহা হয় না, সেইজন্য আপনি তপ

শ্চরণরূপ একটা গভীর খাতে পড়িয়া আছেন, হস্তিরূপকে আমি আপনার দশাই বর্ণন করিয়াছি। আপনার ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ বলিয়া গণ্য নহে।

শিখিধ্বজ।—স্বদেশ, রাজ্য, গৃহ, স্ত্রী, পুত্র—ইত্যাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়াও কি আমি সর্বত্যাগী হই নাই ?

চূড়াল।—রাজ্য, ধন, স্ত্রী, পুত্র—এ সকল আপনার নহে বলিয়া আপনি ত্যাগও করেন নাই। মহারাজ ! আপনি এখনও অনুরাগ ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

শিখিধ্বজ।—আপনার কথা বুঝিলাম। আমি রাজ্যের ত্রায় এক্ষণেই মনোরাজ্যও ত্যাগ করিলাম—বন-বাসনাও ত্যাগ করিলাম।

চূড়াল।—মহারাজ ! বন বলিতেও এই পাহাড়, জঙ্গল বৃক্ষলতা, জনশূন্য প্রদেশটি বুঝা যায়। এই বনটি ত্যাগ করিলেই আপনি সমস্তই ত্যাগ করিলেন—ইহা কিরূপে বলিতে পারেন ? আর এই বনটি কি আপনার যে আপনি উহা ত্যাগ করিলেন, বলিতেছেন ? আপনি অনুরাগ ত্যাগ করুন, তবেই শোক-দুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন।

শিখিধ্বজ এই কথা শুনিয়া ধ্যানস্তিমিত হইলেন। চূড়াল হৃষ্টান্তঃকরণে রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপর রাজা সহসা আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার তপশ্চরণের যে সকল উপকরণ ছিল—পর্ণকুটীর, দণ্ড, কমণ্ডলু, মৃগাজিন, কুশাসন সমস্ত অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলিলেন। অত্যাশ্রয় দ্রব্য এবং আশ্রমপদ ভগ্ন

করিয়া ফেলিলেন, তারপর বলিলেন—

‘আজ এই দেবকুমার আমার অজ্ঞান দূর করিয়াছেন, আমার চিত্ত প্রবোধিত করিয়াছেন। সমস্ত দ্রব্যই সংকল্প-জাত। আজ আমি বন্ধনরূপ ঐ সমস্ত ত্যাগ করিয়া পরমানন্দ ও শান্তি লাভ করিলাম। আজ আমি সর্বব্যাপী, দিগম্বর, দিক্‌সদন ও দিক্‌সম অবস্থায় আসিলাম। হে দেবকুমার! আর কি বাকি আছে, বলুন।’

চুড়লা বলিলেন—হে নরশ্রেষ্ঠ শিখিধ্বজ, এখনও আপনার সর্বস্বত্যাগ সিদ্ধ হয় নাই। আপনি সর্বস্বত্যাগের বৃথা অভিনয় করিবেন না। আপনি এখনও অনুরাগ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কেবল বস্তুত্যাগে অশোকতা লাভ করিতে পারিবেন না।

শিখিধ্বজ আবার চিন্তাপরায়ণ হইলেন, তৎপর বলিলেন—
‘আমি উচ্চ স্থান হইতে এই দেহ পাত করিয়া সর্বব্যাপী হইব।’
কথা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি সবেগে উত্তীর্ণ হইলেন।

চুড়লা বলিলেন—মহারাজ। দেহটী কি দোষ করিয়াছে যে আপনি উহা নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন? ঝাঁড় ফেপিয়া গিয়া একটি ক্ষুদ্র বাছুরকে মারিয়া ফেলে দেখা যায়—আপনার কার্য্যটিও তদ্রূপ হইতেছে। দেহ ত’ জড়, মূক—সে কি স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে? অন্য কর্তৃক চালিত হইয়াই সে যাহা কিছু করে। শরীরে সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয় সত্য। কিন্তু সেজন্য সে অপরাধী নহে। বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া বৃক্ষের ফল পুষ্পাদি পড়িয়া যায়, তাহাতে বৃক্ষের দোষ কি?

এই দেহটাও পদ্মপত্রে জলের ত্রায় অস্থির, উহা ত্যাগ করিয়া আপনি সর্বস্বত্যাগী হইলেন বলিয়া কিরূপে মনে করিতেছেন ? শরীরের কোন অপরাধ নাই, উহাকে উচ্চদেশ হইতে ফেলিয়া দিয়াও আপনি সর্বত্যাগী হইতে পারিবেন না, বরং ঐরূপ করিলে মহাত্যাগী হইলেও আপনি অতীব পাপকলুষিত হইবেন । দেহে অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিলেই প্রকৃতপক্ষে দেহাদি ত্যাগ করা হয় । তাহা না হইলে কেবল দেহটি নষ্ট করিলে উহা বারম্বার জন্মিবে ও দুঃখদায়ক হইবে ।

শিখিধ্বজ ।—তাহা হইলে কিরূপ ত্যাগে সর্বত্যাগ হয় ?

চূড়াল ।—দেহ, গৃহ, রাজ্য বা আপনার এই পৰ্ণকুটীরটি ত্যাগ করিলেই সর্বত্যাগ হয় না । সৰ্ব্বাকারণকারণ নিত্য নিরঞ্জন ভগবানে সমস্ত অর্পণ করাই সর্বত্যাগ ।

শিখিধ্বজ ।—সেই ‘সমস্ত’ বস্তুটি যদি দেহাদি কিছুই না হয়, তবে কি ?

চূড়াল ।—ভ্রান্তচিত্তই ‘সমস্ত’ নামে অভিহিত । কারণ, চিত্তই সংসার-প্রপঞ্চ । মনই রাজ্য, আশ্রম, দেহ, সুখ-দুঃখ-ভোগ সকলের বীজ । কারণ, বাসনানুসারেই এই সকলের উৎপত্তি । মন অর্থাৎ বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলেই সর্বত্যাগ হয় । নতুবা সর্ববস্তু ত্যাগ করিলেও ত্যাগ হয় না । যাহার বাসনাক্ষয় হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সদাই সুখী এবং আধি-ক্যাধি হইতে মুক্ত । চিত্ত সংযত হইলে দ্বৈতভাব—জগৎপ্রপঞ্চ—দূরীভূত হইয়া অদ্বয় অনাময় ব্রহ্মে স্থিতি হয় । মহাশয়,

আপনি বাসনা ত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করুন।

শিখিধ্বজ।—আপনি পুনঃপুনঃ চিত্ত ত্যাগ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু আমার ইহা বড়ই শ্রুতিন মনে হয়। মন হৃদয়রূপ আকাশে পক্ষীর মত, হৃদয়রূপ বৃক্ষের বানরের মত সদাই চঞ্চল। কৃপা করিয়া চিত্তের স্বরূপ ও ক্রীড়ে উহা ত্যাগ করা যায়, বলুন।

চূড়াল।—চিত্ত ও বাসনা একই কথা—তুই নামে একই বস্তুকে বুঝায়। উহা ত্যাগ করা আয়াসসাধ্য নহে—ঔদাসীণ্য-বুদ্ধি দ্বারা এই ত্যাগ সহজেই সিদ্ধ হয়। ইহা দ্বারা রাজ্যলাভ অপেক্ষাও অধিকতর আনন্দ লাভ হয়। অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই চিত্তত্যাগ অসম্ভব।

শিখিধ্বজ।—চিত্তের স্বরূপ যে বাসনাময় তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু উহা ত্যাগ তুষ্কর মনে করি।

চূড়াল।—ঋষিরা বলেন যে, সমস্ত বস্তু নষ্ট হইলেও ঘাঁহার উহা স্মরণ করেন না, বা স্মরণ করিলেও দুঃখিত হন না, তাঁহার চিত্তত্যাগ করিতে পারিয়াছেন।

শিখিধ্বজ।—চিত্তত্যাগ অপেক্ষা চিন্তনাশ আরও দুঃসাধ্য। মানুষের চিত্তই ব্যাধিস্বরূপ—ইহার চিকিৎসা অত্যন্ত আবশ্যক বটে। তাহার উপায় বলুন।

চূড়াল।—নানাদিক্ প্রসারী চিত্ত-বৃক্ষের বীজ হইতেছে অহং-বুদ্ধি। আপনি উহার শাখা-প্রশাখা কাটিয়া ফেলিয়া অহং-বুদ্ধিরূপ মূল উৎপাটিত করুন। বিবিধ বাসনাই উহার বিবিধ

শাখা, এবং স্পন্দনই ফল। এই সকল নাশ করিবার জন্য চাই আপনার পুরুষকার। সমাধি অবলম্বন ও আত্মবিচার দ্বারা চিত্তবৃক্ষের বীজ দন্ধ হইয়া যায়।

শিখিধ্বজ।—হে মুনিবর। আমি বহু পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, জগতের কোন বস্তুতেই অহং পদার্থ নাই। কারণ, উহারা জড়। দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদিও তদ্রূপ। একমাত্র চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাতেই অহং পদার্থের সার্থকতা—ইহাও বুঝি। তথাপি অন্তর্জ্ঞানের অভাবহেতু বহুকাল তপোবুষ্ঠান করিতেছি।

চূড়াল।—আপনি বিশদবুদ্ধিসম্পন্ন—এত দূর যখন বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন আপনার প্রকৃত স্বরূপ কি—তাহা বলুন।

শিখিধ্বজ।—যাহা নিত্য শুদ্ধ, একমাত্র চিদ্রূপ,—আমি তাহার সন্ধান এখনও পাই নাই। যাহাতে চিত্তবৃক্ষের বীজস্বরূপ অহংজ্ঞান ত্যাগ করিয়া সেই পরমপদ লাভ করিতে পারি, তাহা বলুন।

চূড়াল।—অহংবুদ্ধিই যদি চিত্তের বীজ হইল, তাহা হইলে এক্ষণ চিত্তসম্বাপের কারণ কি—বিচার করিয়া বলুন। তৎপর আমি আপনাকে কি কারণ, কি অকারণ,—তাহা বলিব। স্থল বিশেষে অকারণও কারণ হয়, কারণও অকারণ হয়। আপনার অকারণে কারণবুদ্ধি হইয়াছে কি না—বিচার করিয়া বলুন।

শিখিধ্বজ।—দৃশ্যমান জগতে বস্তুসকলের সত্ত্বাবোধ হইতেই

হইতেই দেহাদির উৎপত্তি হয়। বস্তুর উপাদান অন্তরস্থ জ্ঞান। দেহমধ্যে যে বস্তুর অনুভূতি, তাহা অসত্য। অসত্য বস্তু হইতে যে চিন্তাবিকার হয় তাহাও অসত্য।

চুড়ীলা।—যদি অনুভূতিরূপ উপাদান হইতে দেহাদির প্রতীতি হয়, উৎপত্তি হয়—বুঝিয়া থাকেন, তবে আপনার সম্বন্ধেও সেই প্রতীতি অসৎ।

শিখিন্ধজ।—হস্তপদাদি বিশিষ্ট আমার এই দেহ বিনাশ-শীল বটে, কিন্তু উহার অভাব, অর্থাৎ উহা নাই—এইরূপ স্থির করিতে পারিতেছি না।

চুড়ীলা।—প্রত্যেক কার্যেরই একটা কারণ থাকিবে। যাহার কারণ নাই, সেরূপ কোন কার্য থাকিতে পারে না। যে দেহের কোন কারণ নাই, তাহা থাকিতেই পারে না। যাহা নাই তাহাকে যে সত্য বলিয়া মনে করে, সে যুগতৃষ্ণিকায় জলভ্রাস্ত হইয়া বিপদগ্রস্ত হয়।

শিখিন্ধজ।—দেহাদি যদি অত্যন্ত মিথ্যাই হয়, তবে উহার কারণানুসন্ধানে কি ফল? দেহের জনক পিতা, যিনি সকলেরই দর্শনযোগ্য। তিনি কেন কারণ হইতে পারেন না?

চুড়ীলা।—যখন কারণের সত্তাই নাই, তখন পিতাকে কিরূপে কারণ বলা যায়? সত্তাহীন বস্তু অসৎ বা অলীক,—যেমন আকাশকুসুম। বীজ হইতেই অঙ্কুর হয়—সেইরূপ কারণ হইতেই কার্য হয়। যে স্থলে কারণেরই অভাব, সে স্থলে কার্যের প্রতীতি হইলেও তাহা ভ্রম মাত্র।

শিখিধ্বজ ।—পিতামহ, পিতা, পুত্র—ইহাদের কেহই কি কারণ বলিয়া গণ্য নহেন ? পিতার কারণ পিতামহ নহেন কেন ?

চূড়াল ।—রাজন্ ! পিতামহেরও কোন সত্তা নাই । তাঁহারও কোন কারণ নাই । অতএব তাঁহার কোন সত্তাও নাই । পিতামহের কারণ অনুসন্ধান করা এক ভ্রান্তি হইতে অপর ভ্রান্তিতে যাওয়া মাত্র । আপনি এই যে ভ্রমবুদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হইতেছেন, তাহা আমি দূর করিব । যাঁহা হইতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি, সেই সর্বদেবদেব ভগবান্ বিষ্ণু আত্মা হইতে অভিন্ন,—এইরূপ ভাবনা দ্বারা তাঁহাতে চিন্তা সমাধান করুন ।

শিখিধ্বজ ।—সমস্ত জগৎই যদি ভ্রমরচিত হয়, তাহা হইলে জাগতিক ক্রিয়াকলাপ বা ব্যবহার কিরূপে নির্বাহ হইতেছে ?

চূড়াল ।—শৈত্যের দ্বারা যেমন জল কঠিন দশা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই জগৎভ্রম অজ্ঞানের রূপান্তর মাত্র,—অজ্ঞানই ঘনীভূত হইয়া জগৎ ও তদব্যবহারে পরিণত হইয়াছে । জ্ঞানের উদয়ে জগতের মিথ্যা ভ্রম ভূত হয় । ভ্রম দৃষ্টিতে পিতামহাদি সন্তানের কারণ বলিতেছেন । অসত্য বস্তু হইতে সত্য বস্তু জন্মে না । আত্মতত্ত্ব বিচারে অসত্যে সত্যত্ব-বুদ্ধি দূর হয়,—যেমন শুদ্ধিজ্ঞানে উহাতে ভ্রমজন্য রজত-জ্ঞান দূর হয় ।

শিখিধ্বজ ।—হে ব্রহ্মন্ ! অসত্য পিতা-পিতামহের কথা ছাড়িয়া দিলাম । যিনি শাস্ত্রত সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম, তিনি সৃষ্টির কারণ হইবেন না কেন ?

চূড়াল ।—পরব্রহ্ম কার্য্য-কারণের অতীত, কার্য্য-কারণাদি

রহিত, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অতীন্দ্রিয়, তর্কের অগোচর। তিনি কিরূপে
কর্তা হইতে পারেন? অতএব দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা বলিয়া
জানিবেন। * এই জ্ঞান দ্বারা বন্ধন ও মোক্ষ হইতে আপনার
বিমুক্তি লাভ হইয়াছে।

* ব্রহ্মের তিন রূপ,—কার্যরূপ, কারণরূপ, তুরীয় রূপ, অর্থাৎ একই
ব্রহ্ম এই তিন রূপে প্রতীত হন। ব্রহ্মাদি যাবতীয় বস্তুই কারণ ব্রহ্ম হইতে
উৎপন্ন কার্যরূপ। মায়া শক্তির সহিত ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা-পাতা-বিধাতা
কারণ ব্রহ্ম, যাহাকে ঈশ্বর বলা হয়। এই কারণ ব্রহ্মই ব্রহ্মা-বিষ্ণু রুদ্র
রূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন। শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী প্রভৃতি
নামে বা রূপে, অথবা নামরূপ নিরপেক্ষ ভাবে উক্ত ঈশ্বরের যে উপাসনা
তাঁহা কারণ ব্রহ্মেরই উপাসনা। কার্য-কারণের অতীত-রূপে, সৃষ্টি স্থিতি
লয়ের অতীতরূপে সেই ব্রহ্মই তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ-স্থানীয়। তুরীয় অদ্বৈত
স্বরূপ,—ইহাতে সৃষ্টি নাই, স্তবরাং স্রষ্টাও নাই, দৃশ্য নাই, স্রষ্টা নাই,—
'অত্র কেন কং পশ্যেৎ'। সৃষ্টি মায়াবশিত 'কাদাচিৎক' কখনও আছে,
কখনও নাই। উহা আদিতেও অর্থাৎ পূর্বেও ছিল না, অন্তেও থাকিবে
না, স্তবরাং মধ্যেও অর্থাৎ বর্তমান সময়েও নাই। সৃষ্টি ত্রিকালেই মিথ্যা,
তুরীয় ব্রহ্ম ত্রিকাল সত্য। এই সত্যস্বরূপ আধার বা অধিষ্ঠানের উপর
জীব অজ্ঞান জন অধ্যস্ত মিথ্যা জগৎ দর্শন করিতেছে। চিত্তস্থিত অনাদি
সংস্কার-প্রবাহ হইতেই জগৎ-ভ্রান্তি হইতেছে। সংস্কৃপী ব্রহ্মের সত্তারই
জগতের সত্তা এবং তাঁহার চিৎরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ প্রকাশেই উহার
প্রকাশ। তত্ত্বি জগতের অন্ত সত্তা বা প্রকাশ নাই। বাস্তব সত্তাশূন্য
জাগতিক বস্তু মাত্রই 'দৃষ্টি-সৃষ্টি' ও 'দৃষ্ট নষ্ট' অর্থাৎ যতক্ষণ দেখিতেছি,
যতক্ষণ জ্ঞানে উদ্ভাসিত থাকে, ততক্ষণই বস্তুর অস্তিত্ব, আবার দেখিতে

শিখিধ্বজ ।—ভগবন্! আপনার কৃপায় ও উপদেশে আমি আজ বিশুদ্ধায়া হইলাম । এক্ষণে আর আমি এই দৃশ্যমান জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দেখিতেছি না । কর্তার অভাব বশতঃ জগতের পৃথক্ সত্তা থাকিতে পারে না । আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ—ইহাও অনুভব করিতেছি । আজ আমি উপশম লাভ করিলাম—নির্ব্বাণ লাভ করিলাম; আমি এক্ষণে জন্ম-মরণের অতীত । আপনার কৃপায় আমার সমস্ত দ্বৈতবুদ্ধি অপসারিত হওয়ায় আমি এখন শান্তিস্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়াছি ।

শিখিধ্বজ এক্ষণে চূড়ালার সমক্ষেই নির্বিবকল্প সমাধিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।

চূড়াল ।—মহারাজ ! আপনি মোহবিমুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ

দেখিতেই উহা নষ্ট হয় । দৃষ্টির বাহিরে, জ্ঞানের বাহিরে যে জগৎ আছে তাহার কোন প্রমাণ নাই ।

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমান নগরী তুলাং নিজাস্তগতং ।

পশুন্ আত্মনি মায়ায়া বহিরিবোদ্ধতং যথা নিদ্রয়া ॥

দর্পণে দৃশ্যমান নগরীর স্থায় এই বিশ্ব ব্যাপক আত্মায় কল্পিত ও প্রতীতি মাত্র । যেমন নিদ্রাদোষাভিভূত ব্যক্তি কর্তৃক দৃষ্ট স্বাপ্নিক দৃশ্য একেবারেই মিথ্যা, অথচ সত্য বস্তুর স্থায় ভাসমান হয়, এবং যেমন উহা স্বপ্ন-সাক্ষী তৈজস আত্মায় প্রতীত হয়, সেইরূপ মায়াভিভূত ব্যক্তি কর্তৃক দৃষ্ট জগৎও ত্রিকালেই মিথ্যা, অথচ সত্য বস্তুর স্থায় শুদ্ধ আত্মায় ভাসমান হয় । সেইজন্য শাস্ত্র বলেন,—‘চিন্তমেব হি সংসারঃ’—চিন্তাই সংসাররূপে প্রতীত হইতেছে ।

মহাদেবের শ্রায় অবস্থান করিতেছেন। আপনি জীবমুক্ত হইলেন।

শিখিধ্বজ।—আপনার কৃপায়ই ইহা হইল। এক্ষণে আমি বিদিততত্ত্ব, তথাপি আপনাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিব,— উত্তর দিয়া সুখী করুন। মায়াহীন ব্রহ্মে আত্মা যখন উপরত হয় তখন জগদ্দর্শন-ব্যাপারে দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্য—এ সকল কি প্রকারে অনুভূতির বিষয় হইতে পারে ?

চুড়াল।—আপনার প্রশ্নটি বড়ই সুন্দর। এই দৃশ্যমান জগৎ কল্পান্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে গাঢ় অন্ধকারের উদয় হইবে। তৎপর অন্ধকারও থাকিবে না, তেজও থাকিবে না। তখন একমাত্র অত্যুজ্জ্বল শাস্ত, স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূল, স্থির হইতেও স্থির, গুরু হইতেও গুরু, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ চিৎ-শক্তি দ্বারা শিবরূপী আত্মাই বিরাজিত থাকিবেন। সেই

মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।

মনসো হৃদনীর ভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥ - গৌড়পাদ

বিশ্বে দৃশ্যমান দ্বৈত অর্থাৎ নানা পদার্থ সমস্ত মনেরই রূপ। মন যখন লয় প্রাপ্ত হয় (যেমন সুষুপ্তিতে বা সমাধিতে) তখন আর নানাত্বের উপলব্ধি হয় না।

জীবের আত্মদৃষ্টি জাগ্রত না হওয়া পর্য্যন্ত জগৎ মিথ্যা হইলেও কারণ ব্রহ্মরূপী ঈশ্বর মায়াবর্তিত জগতের নিয়ন্ত্রণ জন্ত একটা মায়াবর্তিত কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা স্থির রাখেন, যাহাতে জীব সকল নিজ নিজ কৰ্ম সংস্কার-স্থায়ী ভোগ দ্বারা মোক্ষলাভ করিতে পারে।

পরমাআই' অহং-জ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া জীবাআরূপে প্রতিভাত হন। বায়ুস্পন্দ হইতে বায়ু যেমন পৃথক্ নহে, শূন্যতা ও আকাশ যেমন পৃথক্ বস্তু নহে, সেইরূপ পরমাআ হইতে, জীবাআ পৃথক্ নহে। অহং-জ্ঞানাচ্ছন্ন আআই অনুভবকর্তা, অহং-জ্ঞানের অবসানে জীবাআ-পরমাআ একই। আবার এই জগৎও ব্রহ্মা হইতে পৃথক্ নহে—যেমন তরঙ্গ জল হইতে বা হার-বলয়াদি সুবর্ণ হইতে পৃথক্ নহে। তরঙ্গ শব্দের অর্থ (তরঙ্গ বস্তুটী) না থাকিলে জল ভিন্ন অণু কিছুই প্রতীতি হয় না। সেইরূপ সৃষ্টি বস্তুটি অর্থরহিত হইলে ব্রহ্ম ভিন্ন অণু কিছু অনুভূত হয় না। যখন যাহার জগৎ হইতে ব্রহ্মের পৃথক্-বুদ্ধি হয়, তখন তাহার নানা-ধ্বের অনুভূতি হয়,—তখন দৃক্-দৃশ্য বোধ হয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ-রূপে ভ্রম জন্ম। ভ্রমসৃষ্ট পদার্থের ভ্রমই কারণ, শুদ্ধব্রহ্মে কার্য্য-কারণত্ব, দৃষ্টা-দৃশ্যত্ব কিছুই নাই।

শিখিধ্বজ।—অহং-জ্ঞানাত্মীন জগতেরই একটা কারণ অনুমান হয়—ইহা সত্য বটে।

চুড়ামা।—আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন। একমাত্র শিবাত্মক ব্রহ্মই আছেন। জগতের বাস্তব সত্তা নাই। যাহা নাই—নিরূপাধি তত্ত্বজ্ঞানে যাহা দেখিতেই পাওয়া যায় না—তাহার দর্শন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া কি ফল? নান্য-রূপময় এই জগৎ বস্তুকল্পে নাই, প্রতীতিকল্পে আছে—এই প্রকার দ্বিরূপতা বশতঃ যাহা আছে বা নাই বলিবার অযোগ্য, তাহা অব্যাপদেশ্য। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য।

ব্রহ্মবস্তু স্বপ্রকাশ। তিনি ইন্দ্রিয় বা মন-বুদ্ধির গ্রাহ্য নহেন। তাঁহাকে দেখা যায় বলা, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনও তদাশ্রিত মায়াবিশেষ। মায়াদৃষ্টির কারণ মায়াই। ব্রহ্ম সৎ, মায়া অসৎ। চিন্ময় ব্রহ্মই মায়ার দ্বারা জগদাকার প্রাপ্ত হইয়াছেন,—ইহাই তত্ত্ববিদগণের সিদ্ধান্ত। বিচার করিয়া দেখুন—এই বস্তু সৎ, এই বস্তু অ-সৎ, অথবা ইহা স্বচ্ছ, ইহা অ-স্বচ্ছ,—এই ভাবদ্বয়ের মধ্যে অ-সৎ বা অ-স্বচ্ছ ভাব মিথ্যা বলিয়াই স্থিরীকৃত হয়। কারণ সৎ (আছে) পক্ষই প্রথমোদিত, অতএব স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, এবং অসৎ (নাই) এই পক্ষ তদ্বিপরীত অর্থাৎ সৎভাবে পূর্বে উদিত হয় না, অতএব স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ নহে। ব্রহ্ম বা আত্মা চিরন্তন সত্য। জগৎ যখন থাকে না, বিনষ্ট হয়, তখন সেই নাশের জ্ঞাতা কে? বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় যে, চিন্ময় ব্রহ্মই বা আত্মাই উহার জ্ঞাতা। অতএব সর্বাবস্থায়ই আত্মা সত্য, অবিনাশী। অন্য সমস্তই ভ্রমপ্রপঞ্চ। যাহা কিছু দেখিতেছেন, শুনিতেছেন,—সমস্তই মায়ার বা মিথ্যাবুদ্ধির মহিমা, আর কিছুই নহে। পূর্বেই বলিয়াছি—বাসনাই চিন্তা, চিন্তাই জগৎ। নির্বাসন চিন্তের সত্তা নাই, চিন্তের নাশে জগৎও থাকে না। শাস্ত্র ও অনুভব দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হয়। যাহারা শাস্ত্রকে, বেদকে অপ্রমাণ বলে, তাহারা মূঢ়,—তাহাদের সঙ্গ করা উচিত নহে। ঋতি ব্রহ্মকে যে জগৎকারণ বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য জগতের ব্রহ্মাভিন্নতা পক্ষেই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং তদ্বারা নিরাকার ব্রহ্মের সাকার কারণতা

পক্ষ নিরাকৃতই হয়। মায়াপ্রপঞ্চ এই জগৎ থাকে থাকুক, আপনি ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে অবিচলিত থাকুন।

শিখিধ্বজ।—হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে দুর্লভ বস্তু প্রাপ্ত হইলাম। যে মহামৃত লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার শত শত জন্মেও ঘটিত না, অতঃ আপনার সমাগমে তাহা পাইলাম। ইতিপূর্বে আমি কেন আত্মস্থিতি লাভ করিতে পারি নাই?

চূড়াল।—ভোগ-বাসনা থাকিলে আত্মপদ লাভ হয় না। প্রত্যেক দেহী জীবের চিত্তে অশুভ সংস্কার সঞ্চিত থাকে। ঐ সংস্কারগুলি পাক প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তের বিজ্ঞান হয় না এবং পাকপ্রাপ্ত হইলেই শাস্ত্র, গুরুর উপদেশ কার্য্যকরী হয়—যেমন শুভ্র বস্ত্রে কুসুমের রং ধরে, মলিন বস্ত্রে নহে। বৃক্ষের ফল পরিপক্ব না হওয়া পর্য্যন্ত বৃক্ষেই সংলগ্ন থাকে, পরিপক্ব হইলে বৃক্ষ হইতে তলায় পড়িয়া যায়—চিত্তের সংস্কার সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। হে সাধো! বহুজন্ম পরে আজ আপনার অশুভ বাসনারাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। আজ আপনাকে আমি প্রবুদ্ধ করিলাম। জ্ঞানপ্রাপ্তি মাত্র এই মুহূর্ত্তেই আপনার শুভাশুভ সমুদয় কর্ম্মের অবসান হইল। আপনি বীতশোক হইয়া জীবন্মুক্তি-পদ লাভ করিলেন।

শিখিধ্বজ।—হে প্রভো! জীবন্মুক্তের আচার-ব্যবহার কি রূপ? আপনার ত্রায় মহাত্ম্যে ব্যক্তিগণ কি করিয়া থাকেন, বলুন।

চূড়াল।—জীবন্মুক্তের চিত্তে বাসনার অক্ষুরোৎপত্তি হয়

না। তিনি এমন কার্য্য করেন না, যাহা ভাবী জন্মের বীজস্বরূপ হয়। জীবন্মুক্ত সর্ববাবস্থায়ই সংযমী, আসক্তিশূন্য। মোহভ্রান্ত চিত্তকেই 'চিত্ত' বলে, প্রবুদ্ধ চিত্তকে 'সত্ত্ব' বলে। চিত্তের জন্ম হয়, সত্ত্বের জন্ম হয় না। জীবন্মুক্ত সদাই সত্ত্ববান্। আপনি সত্ত্ববান্ হইয়াছেন। এক্ষণে চূড়াল-সংসর্গেও অনায়াসে আপনার স্থিত-প্রজ্ঞতা পূর্ণ থাকিতে পারে। আপনি কেন তপোধর্মের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন? তপোধর্মের প্রথমে আচরণাবস্থা, মধ্যে উহার ফল স্বর্গের ভোগ, অন্তে ফলক্ষয়। এই তিনই বন্ধনদশার অন্তর্গত। আপনি তপশ্চরণ করিয়া বন্ধাবস্থায়ই ছিলেন। ব্রহ্মবিদগণের নিকট এইরূপ সঙ্কল্প অতি তুচ্ছ। যে জ্ঞী প্রণয়া-স্পদ পতি-সমাগম লাভ করিয়াছে, সে কি পত্যন্তর কামনা করে? তপশ্চরণাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান চিত্তচাপল্য জন্ম। তত্ত্ব-জ্ঞানী চাপল্য-অচাপল্য দুই-ই ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মভাবে থাকেন।

শিখিধ্বজ—চাপল্য অচাপল্য—দুইটি বিরুদ্ধ ধর্মের ঐক্য সিদ্ধ হয় কিরূপে?

চূড়াল—ব্রহ্মবস্তুরে সকল বিরুদ্ধ ধর্মই সমতা প্রাপ্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞ দেখেন যে, যেমন জলের স্পন্দন তরঙ্গ, তেমনি বুদ্ধির স্পন্দন চিৎ-পদার্থেরই স্পন্দন,—অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন তাঁহার ঐ সকলকে অন্তরূপে দেখেন না। অতএব স্পন্দ, অস্পন্দ—সমস্তই মিথ্যা নিশ্চয়ে সম্যক্ জ্ঞানে উভয়ের ঐক্য হয়। শাস্ত্রা-লোচনা, সংসঙ্গ, নিরন্তর অভ্যাস—এই সকল উপায়ে ঐ সত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সমস্ত তত্ত্বই আপনাকে বলিলাম, এবং আপনি সব

শুনিলেন। এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। আমি এক্ষণে একটি পর্ব্বোপলক্ষ্যে স্বর্গলোকে যাইতেছি। কারণ অমর-সভার ব্রহ্মলোক হইতে নারদের আগমন হইয়াছে। আপনি এই স্থলেই থাকুন।

প্রণাম করিতে উদ্যত শিখিধ্বজের প্রণাম বা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ চূড়ালী অন্তর্দ্বান করিলেন। তাঁহাকে সহসা অদৃশ্য হইতে দেখিয়া শিখিধ্বজ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে শিখিধ্বজ নির্বিকল্প সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক গিরিশৃঙ্গের আয় অটল অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। চূড়ালী আকাশ-মার্গে উত্থিত হইয়া আবার রমণী-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, পুনর্ব্বার রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিন দিন পরে আবার আকাশপথে কুন্তরূপে শিখিধ্বজের নিকট আগমন করিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার পতি একেবারে বাহ্য স্পর্শশূন্য নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া আছেন। চূড়ালী তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবেন কি না ভাবিতে লাগিলেন। কেবল বাক্যের দ্বারা সমাধিভঙ্গ হইবে না, এইজন্য চূড়ালী তথায় পুনঃপুনঃ ভয়ঙ্কর সিংহনাদের সৃষ্টি করিলেন। ভীষণ শব্দে গিরিশ্রেণী প্রকম্পিত হইল, কিন্তু সমাধিমগ্ন শিখিধ্বজ একটুও বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি রাজ-শরীর পাতিত ও চালিত করিলেন,—তাহাতেও তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন না।

সমাধিস্থ ব্যক্তি কি প্রকারে পুনঃপ্রবুদ্ধ হয়, এস্থলে

রামচন্দ্রের এই প্রেমের উত্তরে বশিষ্ঠদেব বলিয়াছিলেন যে, বীজে যেমন ফল পুষ্প অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, সমাধিশান্ত ব্যক্তির হৃদয়েও সেইরূপ অনুভব শক্তি সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে। কারণ সহযোগে উহা পুনঃ কার্য্যকরী হয়। কিন্তু জলের যেমন শান্তাবস্থায় তরঙ্গোৎপত্তি হয় না সেইরূপ সত্ত্বশীল ব্যক্তির চিত্তও বিক্ষুব্ধ হয় না। শিখিধ্বজের সমাধিস্থ দেহ সত্ত্বাংশে সংগ্রথিত,—তাহাতে কোন বিকার স্পর্শ করিতে পারে না।

চুড়ীলা পতির দেহ কোনরূপেই জাগ্রৎ করিতে না পারিয়া যোগবলে স্থলদেহ ত্যাগ করিয়া চিত্ত দ্বারা শিখিধ্বজের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় স্পন্দন উত্থাপিত করিয়া অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত জ্ঞানবৃত্তিকে জাগরিত করিয়া তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিলেন। শিখিধ্বজ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন এবং স্থলদেহে পুনরাগতা কুন্তবেশী চুড়ীলাকে বলিলেন—

‘হে মুনিকুমার, আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি পুনরায় এখানে আসিয়াছেন।’

চুড়ীলা—আপনার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু চিত্ত আপনাতেই সংলগ্ন ছিল। আপনাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গেও বাঁস করিতে চাহি না। আমি আপনার কাছেই থাকিব। আপনার শ্রায় সূক্ষ্ম জগতে আর আমার কেহ নাই।

শিখিধ্বজ—আপনি বীতস্পৃহ হইয়াও আমার সমাগম ইচ্ছা করেন—ইহা আমার বহু পুণ্যের ফল। আপনি যথাসুখে

এই স্থানে অবস্থান করুন,—আপনার অলভ্য সঙ্গ ও উপদেশ লাভ করিয়া আমি পরম সুখী হইব ।

চুড়াল—আপনি এক্ষণে পরম শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন ত' ?

শিখিধ্বজ—আপনার অনুগ্রহে আমি এক্ষণে সংসারের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি । যাহা একমাত্র লভ্য, এতদিনে তাহা লাভ করিয়া আমি পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছি ।

(৪)

চুড়াল ও শিখিধ্বজ উভয়ে পূর্ববর্তের নানা রমণীয় বন-প্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে আটদিন অতিবাহিত হইল । তৎপর চুড়ালার ইচ্ছায় তাঁহারা বনান্তরে প্রবেশ করিলেন এবং উভয়ে সমচিন্ত ও মুক্ত অবস্থায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এক চৈত্রমাসীয় শুদ্ধ প্রতিপদ দিবসে চুড়াল বলিলেন যে সেইদিন স্বর্গে মহাদেবের উৎসব হইবে এবং তিনি পিতৃসন্দর্শনার্থ তথায় গমন করিবেন । চুড়াল তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে উখিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন । শিখিধ্বজ উর্দ্ধদেশে চাহিয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন । শিখিধ্বজের দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া চুড়াল স্বীয় রমণীমূর্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং নিজ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ; অল্প সময়ের মধ্যে রাজকার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় পতির নিকট আগমন করিলেন । চুড়ালকে সেদিন কিছু চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়া শিখিধ্বজ জিজ্ঞাসা করিলেন—

আজ আপনাকে অশ্রমনস্ক ও আপনার মুখ স্নান দেখিতেছি কেন ? আপনার আবার কিসের দুঃখ ?

চুড়াল বলিলেন—মহারাজ ! জীবমুক্ত ব্যক্তির আশ্রয় কল্পানুসারে কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের বশবর্তী হন। সমচিন্তিতা নিবন্ধন তাঁহারা দুঃখ-গ্লানি যদিচ অনুভব না করেন, তথাপি যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন তাঁহাদিগকে কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের বশবর্তী হইয়া থাকিতে হইবেই। কেবল বুদ্ধি দ্বারা দেহ-ব্যাপার চলে না। দেহ ধারণ করিলে সুখ-দুঃখভোগ নিয়তির বিধান অনুসারে জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলকেই করিতে হয়, প্রজাপতিকেও করিতে হয়।

শিখিধ্বজ—যদি নিয়তি ছুপরিহার্য্যই হয়, তবে আপনি তজ্জন্ম চিন্তিত হইতেছেন কেন ?

চুড়াল—অতঃপরে আমি আপনার নিকট হইতে আকাশপথে গমন পূর্ব্বক অমরাবতীতে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রসভায় পিতৃদেবকে দর্শন করিয়া পুনরায় নভঃপ্রদেশ দিয়া এখানে আসিতেছিলাম। জলপূর্ণ মেঘপ্রদেশে দুর্কাসা মুনিকে আসিতে দেখিলাম। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম—‘হে মুনিবর ! নীলবর্ণ বস্ত্র-পরিহিত, মেঘপথে গমনকারী আপনাকে অভিসারিকার শ্রায় দেখাইতেছি।’ দুর্কাসা কুপিত হইয়া আমাকে ‘তুমি রমণী হও’ বলিয়া অভিশাপ দিলেন। শাপানুসারে আমাকে রাত্রিতে রমণী হইয়া থাকিতে হইবে, এবং দিবাভাগে পুংরূপ ধারণ করিতে হইবে—এইজন্ম চিন্তিত হইয়াছি।

শিখিধ্বজ।—আপনি পুং বা স্ত্রী যে রূপই ধারণ করুন,

তাহাতে আপনার কোন ক্ষতি নাই। আপনি আত্মস্বরূপ, দেহের পরিবর্তনে আপনার কি ?

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে চূড়াল ভাবিলেন—
রূপযৌবনসম্পন্ন স্ত্রীর ভর্তার আশ্রয়ে থাকা উচিত, নতুবা বিপদ
আছে। তিনি শিখিধ্বজকে বলিলেন—‘মহারাজ ! আমি প্রতি
রাত্রিতে স্ত্রী-দেহ প্রাপ্ত হই ; অতএব আমি কোন মহাপুরুষকে
পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করি। সে মহাপুরুষ অশ্রু কেহ
নহেন—আপনিই।’

শিখিধ্বজ। আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক। আমি
ইহার ভাল-মন্দ জানি না। আমার মন সমতাপ্রাপ্ত। ত্রিজগৎ
আমার আত্মারই স্বরূপ।

সেইদিন শ্রাবণী পৌর্ণমাসী তিথিতে তাঁহাদের বিবাহ সম্পন্ন
হইল। চূড়াল যোগবলে বিবাহানুষ্ঠানের উপযোগী মূল্যবান
দ্রব্যসম্ভার সৃষ্টি করিয়া সেই পার্বত্য প্রদেশকে বিচিত্র শোভায়
শোভাষিত করিয়াছিলেন। স্ত্রী-দেহে তিনি নিজের নাম
রাখিয়াছিলেন—‘মদনিকা’। এই দেব-দম্পতী সুরম্য মহেন্দ্র
পর্বতে সর্বলোক পূজিত হইয়া একমাস বাস করিলেন, এবং
অন্যান্য স্থানেও বাস করিয়াছিলেন। চূড়াল মধ্যে মধ্যে নিজ
রাজধানীতে গিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেন। এই
রূপে কয়েক মাস অতীত হইল। শিখিধ্বজ এখন একেবারে
ভোগবাসনাশূন্য কি না পরীক্ষা করিবার জন্য চূড়াল মায়া দ্বারা
অঙ্গরোমণ্ডল-বেষ্টিত সপরিকর ইন্দ্রের আবির্ভাব করাইলেন।

শিখিধ্বজ দেবেন্দ্রকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। সুরপতি তাঁহাকে স্বর্গে আগমন করিয়া বিবিধ সুখ ভোগ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন, এবং বলিলেন যে শিখিধ্বজকে দেখিবার জন্য অমরলোকবাসীরা অতীব উৎসুক হইয়াছেন।

শিখিধ্বজ বলিলেন যে, তিনি সর্বসুখের অবধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বর্গসুখ তাঁহার নিকট তুচ্ছ, অতএব তিনি দেবরাজের আদেশ পালনে অসমর্থ। এই কথা বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন। চুড়াল মায়া সম্বরণ করিলেন। দেবগণ সহ দেবরাজ অন্তর্দ্বান করিলেন। পরে শিখিধ্বজ রাগদ্বেষ শূন্য হইতে পারিয়াছেন কিনা দেখিবার জন্য চুড়াল তাঁহাকে আর একটি বিষম পরীক্ষায় ফেলিলেন। তিনি যেন পরপ্রেমমুগ্ধ হইয়াছেন, এবং অণু কোন নায়কের সহিত বিহার করিতেছেন—মায়া দ্বারা এইরূপ এক দৃশ্য রচনা করিলেন। সময় অতীত হইলেও মদনিকা আসিতেছেন না দেখিয়া শিখিধ্বজ অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহাকে এক মনোহর লতাগৃহে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, এবং মদনিকাকে হর্ষান্বিতা দেখিয়া নিজেও অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন। তিনি মদনিকার কার্য্যে কোন বিষ উৎপাদন করিবেন না—প্রশান্তচিত্তে তাঁহাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া স্বস্থানে আগমন পূর্ব্বক ধ্যানাবলম্বন করিয়া রহিলেন। চুড়াল মায়া সম্বরণ করিয়া শিখিধ্বজ সমীপে আসিলেন এবং সত্যই যেন এইরূপ ঘটনা হইয়াছে এইরূপ ভাণ করিয়া রাজার নিকট ক্রমা-প্রার্থনা করিলেন। শিখিধ্বজ বলিলেন, আকাশে যেমন

বৃক্ষোৎপত্তি হয় না, তাঁহার চিত্তেও সেইরূপ রাগদ্বেষের উদয় হইতে পারে না। কেবল সাধুগণের অননুমোদিত হইবে বলিয়া তিনি আর মদনিকাকে বধুরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এই কথা বলিয়া তিনি মদনিকাকে যথেষ্ট বিহারের জন্য অনুমতি দিলেন। চূড়াল দেখিলেন—শিখিধ্বজের চিত্ত এক্ষণে সর্ব-প্রকার দোষবর্জিত। তিনি তখন নারায়ণতুল্য শিখিধ্বজকে সমস্ত আত্মবিবরণ স্বরণ করাইতে মনঃস্থ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মদনিকারূপ ত্যাগ করিয়া চূড়াল-রূপে মহারাজ শিখিধ্বজের সম্মুখে আসীন হইলেন। শিখিধ্বজ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

অয়ি সুন্দরি, তুমি কে? কোথা হইতে আসিলে? কতক্ষণ আসিয়াছ? কি নিমিত্তই বা আসিয়াছ? তোমাকে আমার নিজ দয়িতার স্থায় বোধ হইতেছে।

চূড়াল—হে প্রভো! আপনার অনুমান ঠিক। আমি সেই চূড়লাই, অত্ৰ কেহ নই, সংশয় করিবেন না। আমি এই অকৃত্রিম দেহে অদ্যই এখানে আসিয়াছি। কুস্তাদি আমারই কৃত্রিম রূপ। আপনি যেদিন রাজ্য ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, সেই দিন হইতেই আপনাকে প্রবোধিত করিবার জন্য আমি যত্ন করিতেছিলাম। হে মহীপতে! কুস্তাদি দেহ আমার মায়া-রচিত, সত্য নহে জানিবেন। আপনি স্বয়ং ধ্যানপথে সমস্ত ঘটনা বিদিত হইতে পারেন।

রাজা ধ্যানযোগে রাজ্যত্যাগ সময় হইতে বর্তমান ঘটনা

পর্যন্ত সমস্ত দেখিতে পাইলেন। তিনি নিঃসন্দেহ হইয়া মহারানী চুড়লাকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। পরস্পরের সহযোগে উভয়ে অপরিসীম আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। শিখিধ্বজ বলিলেন—

‘নারীজাতির মধ্যে তুমি বরণীয়া। আজ পুণ্যরাশি চতুর্দিকে প্রকাশিত হইতেছে। অমৃত অপেক্ষাও তোমার সঙ্গ মধুর বলিয়া মনে করিতেছি। তুমি আমি অভিন্ন মনে হইতেছে। তুমি নিজ পতির জন্ত অভাবনীয় ক্লেশ সহ্য করিয়াছ। তুমিই আমাকে দারুণ সংসার-গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়াছ। অরুদ্ধতী, শচী, গৌরী, গায়ত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী অপেক্ষাও তুমি আধিক্যবতী হইয়াছ। ধী, লক্ষ্মী, কান্তি, ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা—এই সকল মহীয়সী দেবীদিগকেও তুমি গুণ দ্বারা পরাস্ত করিয়াছ। আমি তোমার কি প্রত্যুপকার করিতে পারি, বল। প্রেমময়ী কুলনারীগণ, যেৰূপ উদ্ধারার্থ শক্তি ধারণ করেন,—শাস্ত্র, গুরু ও মন্ত্ৰাদিরও সেৰূপ সামর্থ্য নাই। পতির নিকট স্নেহময়ী স্ত্রী সখা, ভাতা, গুরু, মিত্র ও ধন-সম্পত্তিস্বরূপ। এইজন্য কুলস্ত্রী সর্বদা পতির মান-নীরা। সাধ্বী রমণীরা স্বামীকে সংসার-সাগর হইতে পার করিতে পাতেন। যেখানে যখন নারীগণের সদগুণ-রাশির উল্লেখ হইবে, তখন সে স্থানে তুমি তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হইবে।’

চুড়লা।—হে দেব। আপনার প্রবোধ সম্পাদনে আমারও স্বার্থ ছিল, সুতরাং আমি প্রশংসাপাত্রী নহি।

শিখিধ্বজ ।—তুমি যেমন সথারূপে স্বার্থ সাধন করিলে, আজ সমুদায় কুলনারী এইরূপ স্বার্থ সাধন করুক ।

চূড়াল ।—হে কান্ত ! আপনি বোধ লাভ করিয়াছেন—
এক্ষণে বোধ হয় কল্পনাকূহক রূপ পূর্বের কঠোর তপস্যাদি স্মরণ
করিয়া মনে মনে হাস্য করিতেছেন । যাহা হউক, এক্ষণে
আপনি কোথায় থাকিবেন, বা কি ইচ্ছা করেন ?

শিখিধ্বজ ।—হে পতিব্রতে ! আমি এক্ষণে শান্ত, মোহ-
রহিত । আমি পরমার্থে স্থিতি লাভ করিয়াছি । আমার এ
অবস্থার প্রতিবেদ করিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হরও সমর্থ নহেন ।
আমি কিছুতেই রুষ্ট বা হ্রষ্ট নহি । আমি স্বরূপে অবস্থিত—
কিছু হই নাই, হইবও না । তুমিই আমার গুরু, এবং গুরুরূপে
মমস্তা । তোমারই প্রসাদে আমি আজ শান্তস্বরূপ ।

চূড়াল ।—হে হৃদয়প্রিয় ! যদি তাহাই হয়, তবে বলুন
এক্ষণে কি ভাল লাগে !

শিখিধ্বজ ।—এটা ভাল, ওটা ভাল নহে,—এ দুইয়ের
কিছুই আমি জানি না । তোমার যাহা ভাল মনে হয়, আমার
তাহাই হউক । আমার নিজের কোন ইচ্ছা নাই, তোমার
ইচ্ছানুসারে চলিব । তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক ।

চূড়াল ।—যদি তাহাই হয়, তবে আমার মনের কথা
শুনুন । আপনি এখন জীবমুক্ত, আমরা উভয়েই অদ্বৈত জ্ঞানে
স্থিত, আকাশের ন্যায় নির্লেপ, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা দুই-ই
তুল্য । দেহপাত পর্যান্ত আমাদের এই অবস্থাই থাকিবে, পরে

বিদেহ হইব। আমরা এক্ষণ আদি, মধ্য ও অন্তে তুল্যরূপে বিরাজমান আছি ও থাকিব। অতএব এক্ষণ আপনি আপনার নগরে গিয়া রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হউন, আমি আপনার মহিষী থাকিব। আপনার আগমনে রাজপুরী শোভায়মান হউক।

শিখিধ্বজ।—(হাস্য সহকারে) প্রিয়ে, যদি তোমার তাহাই ইচ্ছা হয়, তবে আমি সেই রূপই করিব। রাজ্য ও বন উভয়ই আমাদের নিকট তুল্য।

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। পরদিবস চূড়াল সঙ্কল্পমাত্রে রাজ্যাভিষেকের বস্ত্র সকল সৃষ্টি করিয়া সেই স্থলেই সপ্তসমুদ্রসলিলপূর্ণ রত্নকুন্তল লইয়া শিখিধ্বজকে অভিষেক করিলেন। শিখিধ্বজও চূড়ালকে রাজ্যোপদে অভিষিক্ত করিলেন। চূড়াল যোগবলে সৈন্য সৃষ্টি করিলেন, এবং সেই স্থানে হস্তী-অশ্ব-রথ-পতাকাসমন্বিত বিরাট বাহিনী উপস্থিত হইল। নিবিড় বনভূমি ও গিরিকন্দর ভেরীনিদাদে নিনাদিত হইল। নৃপদম্পতী রথারোহী হইয়া মহেন্দ্র পর্বত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিজ পুরের সমীপবর্তী হইলে অমাত্যগণ সহ পৌরজনেরা সমস্ত্রমে রাজদম্পতীকে অভ্যর্থনা করিয়া আনন্দলাভ করিলেন। রাজাও প্রজাপুঞ্জকে যথেষ্ট সম্মানিত করিলেন। চূড়াল ও মহাত্মা শিখিধ্বজ বহু বর্ষ সমদৃষ্টি দ্বারা প্রজা পালন করিয়া অন্তিমে নির্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চূড়ালার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। তিনি পুনরায় বন হইতে

রাজাকে সঙ্গে করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। পতিব্রতা পত্নীর অসাধ্য কি আছে!

চুড়ালাকে আমরা দেখিলাম একান্ত পতিব্রতা, এবং তিনি নিজ প্রয়াসবলে মহাজ্ঞানী, মহাযোগিনী, সিদ্ধা, জীবমুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ জ্ঞানমূর্তি মহাযোগিনী নারী পতিব্রতা ও পতিগতপ্রাণা হইলে কি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তাহা আমরা তৎকর্তৃক নিজ পতি শিখিধ্বজকেও জীবমুক্তিপদে আনয়ন ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারি। আমরা আবার চুড়ালার শ্রায় লোকললামভূতা নারীর দেখা পাইব,—এই আশায় শিখিধ্বজ চুড়ালাকে সম্বোধন করিয়া যে শেষ বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া এই আখ্যান সমাপ্ত করিতেছি—

‘তুমি যেমন সখারূপে স্বার্থ সাধন করিলে, আজ সমুদায় কুলনারী এইরূপ স্বার্থ সাধন করুক।’

ইহা সঙ্কীর্ণ স্বার্থ নহে, কিন্তু ইহাই প্রকৃত স্বার্থ, ইহাই পরার্থ, ইহাই পরমার্থ, ইহাই চরম পুরুষার্থ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯	৪	পাথিব	পাথিব
৬৬	৭	মায়া শক্তি	মায়া
৮৩	২	ত্বং	তং
		বিপপতে	বিপপাত
	৩	পরিমোষণো	পরিমোষিণো
১০৫	৩	দর্শন	আপনার দর্শন
১১৯	১৭	অনবিচ্ছিন্ন	অনবচ্ছিন্ন
১৪৯	৮	তুচ্ছ	তুচ্ছ
১৫৬	১	নিজের নিজের	নিজের
১৬৪	২২	বর্ষশাস্ত্র	সর্বশাস্ত্র
১৭০	১৩	নির্ভয়	নির্ভর

নূতন পুস্তক

১। দেবীযুদ্ধে চিন্তনীয়।

উদ্বোধন—গ্রন্থকার ছয় অধ্যায়ে সরল ও মধুর ভাষায় ত্রীশ্রীচণ্ডীর তিন চরিত্র বা আখ্যানের সংক্ষিপ্ত বর্ণন এবং উহাদের প্রত্যেকের চিন্তনীয় বিষয়মধ্যে ঋতিসম্মত তাৎপর্য প্রদান করিয়া এবং আরও চার অধ্যায়ে অল্পসঙ্ক্ষিপ্ত পাঠক মাত্রকেই ‘জ্ঞান পূর্বক’ ত্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী স্বাধায় যজ্ঞে অধিকার লাভে সাহায্য করিয়াছেন। আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রের আধারে শক্তিতত্ত্বের যে বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সম্বন্ধে..... পণ্ডিতসমাজে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী কাশী গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ১৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকায় বিরলপ্রচার বহুমূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়া এই অমূল্য গ্রন্থখানির মূল্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা আশা করি গ্রন্থকারের পূর্ব প্রকাশিত ‘বেদান্তে শক্তিতত্ত্ব’, ‘শক্তি উপাসনা ও বেদান্ত’, এবং ‘ত্রীশ্রীচণ্ডীর চারিটি স্তোত্র’এর স্থায় বর্তমান গ্রন্থখানিও বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করিবে।

The Amrita Bazar Patrika—The author throws new light on old problems, and his philosophical discussions on the significant portions of the book are illuminating and thought provocative. The style of the book is lucid, simple and entertaining, etc., etc

The Calcutta Review—This is an attempt to elucidate the central theme of the Chandi. The author brings out, in language of luminous lucidity, the

spiritual truths that are enacted in the battle between the Asuras and the World-Mother. The book will be an eye-opener to many, and spiritual aspirants will find much light and guidance.

আনন্দবাজার পত্রিকা—.....গ্রন্থকার প্রত্যেক চরিত্রের সংক্ষিপ্ত সার দিয়াছেন, এবং তৎসহ গূঢ় অর্থপূর্ণ অংশের দার্শনিক আলোচনাও প্রদত্ত হইয়াছে। রচনা সরল, সুবোধ্য ও সুখপাঠ্য।.....ভূমিকা গ্রন্থের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছে।

২। সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী

৩। ত্রৈবর্ণিক সন্ন্যাস কাঁসার

The Amrita Bazar Patrika—Pandit Ram Kumar Vidyaratna was at first a preacher of Brahmoism who later on became a sannyasin of the school established by Sri Sri Sankaracharya. He travelled extensively and his "Himaranya" which describes his trip to the Mount Kailasa elicited high praise from discerning critics.

In the first part of the "Sannyasa & Sannyasin" we have an illuminating essay entitled "Sankaravatar O Hindu Dharmer Punuruddhar" by Srimat Swami Ramananda Bharatiji (Pandit Ram Kumar Vidyaratna). In the second part Srimat Swami Durga Chaitanya offers us a critical biographical sketch of Sri Sri Sankaracharya. In the third part the learned author traverses highly interesting grounds, telling us who is fit to be a "Saunyasins", the different schools of Sannyasins in India, the rivalry among the various schools and the Indian monastic system. The learned

author packs a wonderful amount of information in this short book which deserves to be widely read.

There was once a dispute between the princes of Nepal and their court "Pandit" as to the eligibility of a non-Brahmin becoming a Sannyasin, Srimat Swami Kailasa Parvataji, an erudite Punjabee Sannyasin, then happened to be in Nepal and he declared that there was nothing in the Hindu Shastras to prevent a non-Brahmin from becoming a Sannyasin. The volume entitled "Traibarnik Sannyasa Kasar" contains the highly interesting arguments advanced by Swamiji. In the second part we have the rituals which the lay man has to undergo to become a "Sannyasin." The volume should certainly be read by a large number of people.

Sunday—9. 7. 44

আনন্দবাজার পত্রিকা—প্রথম পুস্তকখানির প্রথম প্রবন্ধ "শঙ্করাচার্য ও হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার" শ্রীমৎ স্বামী রামানন্দ ভারতী প্রণীত, বাকী অংশ বর্তমান গ্রন্থকারের রচনা।

হিমালয়ের অতি দুর্গম স্থানে একাধিক বার ভ্রমণ করিয়া মৌলিক উপাদান সংগ্রহপূর্বক তিনি শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার সহিত শঙ্করের জীবনকথা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ গ্রন্থকার সংযুক্ত করিয়াছেন তাহা কাশীনিধি ত্র্যম্বক তেলাংএর ইংরাজী রচনা হইতে গৃহীত। গ্রন্থের শেষোংশে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসের অধিকার সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা। গ্রন্থের শেষে 'সন্ন্যাস পদ্ধতি' দেওয়া হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞানার্থিগণ এই দুইখানি গ্রন্থ হইতে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও বহু সমস্তা মীমাংসার সন্ধান পাইবেন।

যুগান্তর—...বাঙ্গলা ভাষায় জটিল শাস্ত্রবাক্যকে সহজ করিয়া সকলের বোধগম্য করিয়া সম্পাদক হিন্দু মাত্রেই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। “সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী” একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

ব্রজবিদ্যা—...ভারতী মহাশয় শঙ্করের জীবনী প্রভৃতি বিষয়ে মনোজ্ঞভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মতভেদ স্থলে তিনি স্ব-মতের ও অন্তান্ত মতের উল্লেখ করায় গ্রন্থের উপকারিতা বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহারা সন্ন্যাসের ও সন্ন্যাসীর বিষয়ে মূল তত্ত্বগুলি সহজে এক গ্রন্থে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

ত্রৈবর্গিক সন্ন্যাস কাসার মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানি বহু পূর্বে বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানি ইদানীং দুপ্রাপ্য হইয়াছিল। স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী মহাশয় বঙ্গানুবাদ সহিত এই গ্রন্থ পুনরায় প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকবর্গের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে সন্ন্যাস পদ্ধতি প্রদত্ত হইয়াছে।

উদ্বোধন—.....ভারতীজী ইহার (ত্রৈবর্গিক সন্ন্যাস কাসার) বঙ্গানুবাদ সহ নাগরী অক্ষরে মূলটি পুনর্মুদ্রণ করিয়া যুমুক্ষু মাত্রেই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কৈলাসজীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় সন্নিবিষ্ট।

ইদানীং মদ্যেশীয় তরুণগণ পাশ্চাত্য মার্কসীয় ‘ডায়ালেক্টিক্স’ বা আদ্বৈতবাদের মানদণ্ডে ব্যাপ্তি সমষ্টি জীবনের মুখ্যতঃ বাহ্য সমস্তাসমূহের সমাধানে সমুৎসুক। আমাদের অনুরোধ, ইহারা যেন ভারতভূমি-জাত আদ্বৈতবাদের পদ্ধতিও সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ত করিয়া বাহ্য ও আন্তর সমস্তা-নিষ্পত্তি-যোগ্যতা ও তৎসহ বীজবীজের সূক্ষ্মতা সম্পাদনের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন। এই সমগ্রটি প্রয়োজন। ইহাতে তাঁহাদের লাভ বাড়িবে বই কমিবে না। ভারতীয় নব্য ও প্রাচীন জ্ঞান মোটামুটি জানা চাই। বিচারের চমৎকারিত্ব ও সূক্ষ্মতা, যাহা কৈলাসজীর কলমে বিস্তৃত হইয়াছে তাহা আমরা বড়ই

উপভোগ করিলাম। একরূপ উদার শাস্ত্রের বহুল প্রচার বর্তমানে প্রাণের সহিত কামনা করি। কাসার অর্থে জলাশয়, — বিচার-সরোবর।

সমগ্র গ্রন্থখানিতে (সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী) হৃগাঁচৈতন্য ভারতীজীর অকুতোভয়তা ও নিরপেক্ষতা প্রকট। দণনামী সন্ন্যাসীদিগের জীবনাদর্শ ও বর্তমান ভুলচুক, সব কথাই বলা হইয়াছে। বাংলা ভাষায় সন্ন্যাস সম্বন্ধে বহু তথ্য-সম্বিত (৩য় হইতে শেষ অধ্যায়) একরূপ পুস্তক চোখে পড়ে না। আগাগোড়া যুক্তির সঙ্গতি, ভাষার সাধুতা ও সংযম উপাদেয়। প্রত্যেক সত্যাস্থেষী মোক্ষপন্থীর ইহা বার বার পাঠ করা উচিত এবং এতদালোকে জীবন কৃতকৃতার্থ করিতে চেষ্টিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হিন্দী সংস্করণ হইলে ভাল। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র সাধুজনমহলে ইহার আদর হউক।

একখানি পত্র।

পরম পূজ্যপাদ স্বামীজি মহারাজ শ্রীচরণাবিন্দেষু অসংখ্য প্রণতি পূর্বক নিবেদনমেতৎ :—আমি আপনার গ্রন্থ দুইখানি পড়িয়া বড়ই উপকৃত হইলাম। সংস্কৃত গ্রন্থটি বড়ই গম্ভীর এবং তাহার বাংলা অনুবাদ বড় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আপনার “সন্ন্যাস ও সন্ন্যাস” গ্রন্থটি তথ্যবহুল এবং আমার অজ্ঞাতপূর্ব বিষয়ের সন্নিবেশে এত বিচিত্র ও উপদেশপ্রদ বোধ করিলাম যে এই গ্রন্থ না পড়িলে আমি নিজেকে বঞ্চিত মনে করিতাম। আপনার লেখনী অমৃতস্রাব করিয়া থাকে। আমার স্নদৃঢ় বিশ্বাস যে এই গ্রন্থ দুইখানি অধ্যয়ন করিলে সন্ন্যাস সম্বন্ধে কাহারও অশ্রদ্ধা থাকিবে না এবং অনেক ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হইবে। আপনি আমার সহস্র সহস্র ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আশীর্বাদাকাজী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর)

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় শর্মণঃ

(M. A. Ph.D.)

